বিশ্বজয়ী

বিবেকানন্দ

শ্রীমতী গুপ্ত

পরিবেশক
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা :
গৌরী দেবী
৮৭, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীসত্য চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টীং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'বড় বড় মহাপুরুষদের মধ্যে একটা করে জ্ঞানসূর্য থাকে, আর নরেনের মধ্যে তেমন আঠারোটা জ্ঞানসূর্য আছে।' সেই বিশ্বজয়ী বেদান্তের গুরু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা এই সামান্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে চাওয়া ধৃষ্টতা। তবুও মনের আগ্রহকে দমন করতে না পেরে এই কঠিন সাধনায় ব্রতী হয়েছি। ভালো-মন্দের ভার অর্পণ করলাম সেই করুণাময়ের শ্রীচরণে, যিনি তাঁর সৃষ্টির সব ভালো-মন্দের অধিকর্তা। এই পুস্তক রচনার সকল কৃতিত্বটুকু তাঁদের, যে সকল খ্যাতিমান লেখক-লেখিকারা আমার আগে স্বামিজীর মহা-জীবনী রচনা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে নত মস্তকে অকপট চিত্তে ঋণ স্বীকার করছি। আর আমার আন্তরিক প্রণাম জানাচ্ছি বিশ্ববিবেক স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচরণে।

শ্রীমতী গুপ্ত

১৯৫৭

শ্রীমতী গুপ্ত'র অন্যান্য রচনা :

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ভগিনী নিবেদিতা

॥ এক ॥

সিমলের দত্ত পরিবারের খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধন, যশ প্রভৃতির কথা কে না জানতো তখন। গৌরমোহন ষ্ট্রীটের প্রাসাদতুল্য বিরাট বাড়ীটি দেখলেই দত্ত পরিবারের বৈভবের কথা অনুমান করে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয় না।

বিশালদেহী দারোয়ান পাহারা দেয় পালাবদল করে সিং-দরজায়।

তাছাড়া বাড়ীর মধ্যে আত্মীয়স্বজন, দাসদাসীর অভাব নেই। সব মিলিয়ে বাড়ীটা যেন গমগম করছে।

বারো মাসে তেরো পার্বন লেগেই আছে। অতিথি-অভ্যাগতের বিরাম নেই।

রামমোহন দত্তের আমল থেকেই দত্ত পরিরারের এতো জাঁক-জমক। তিনি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের একজন নামকরা আইন ব্যবসায়ী।

রামমোহনের পুত্র দুর্গামোহন দত্তও পিতার মত অল্পদিনেই আইন ব্যবসায়ে খুব নাম করলেন। রোজগারও করতে লাগলেন প্রচুর।

কিন্তু দুর্গামোহনকে বেশিদিন পার্থিব সুখ তৃপ্তি দিতে পারে না। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। সর্বদাই সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায় আনন্দ পেতেন।

যৌবনেই তিনি একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথ ও স্ত্রীর ভার আত্মীয়-স্বজনের হাতে দিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

বছর ছ'য়েক ভারতের নানা তীর্থ পর্যটন করে বেড়ালেন।

তারপর সন্ন্যাসধর্মের নিয়মানুযায়ী বারো বছর পর একবার জন্মভূমি পরিদর্শন করতে এলেন।

তাঁর স্ত্রী তখন আর ইহলোকে নেই। আত্মীয়েরা আবার তাঁকে সংসারাশ্রমে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সকলের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

দুর্গামোহন পুত্র বিশ্বনাথকে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর চলার পথে।

কালে কালে বিশ্বনাথের শিক্ষা শেষে বিবাহ হ'লো।

স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মগতপ্রাণা। ব্রত, পূজা, উপবাস কোনটিই বাদ যায় না। অত্যন্ত ভক্তিভাবে সনাতন হিন্দুনারীর সকল কর্তব্যই পালন করেন।

গৃহে প্রতিষ্ঠিত শিবপূজায় তাঁর অখণ্ড নিষ্ঠা।

পর পর চারটি কন্যাসন্তান জন্মালো, কিন্তু একটি পুত্রের মুখ-দর্শনের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মনে মনে বিষণ্ণ।

ভুবনেশ্বরী দেবী দেবাদিদেবের শ্রীচরণে চোখের জলে প্রার্থনা জানান।

কাশীতে থাকতেন তাঁদের এক আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে পত্রের যোগাযোগে প্রায়ই জানাতেন তাঁর মনের বেদনা। কাশীবিশ্বনাথের চরণেও জানালেন তাঁর একান্ত কামনা।

সেদিন উপবাসী থেকে ভুবনেশ্বরী দেবী শিবপূজা করলেন।

তাঁর পবিত্র বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় দেবাদিদেবের চিন্তায় নিমগ্ন রইলো। মনের সবটুকু জুড়ে যেন একমাত্র মহাদেব ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।

পুজোর পর ধ্যানে বসেছেন ভুবনেশ্বরী দেবী।

দেখতে দেখতে দিনের আলো শেষ হয়ে রাত্রের প্রথম প্রহর শেষ হয়ে যায়। এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন ভুবনেশ্বরী।

শিশুরূপী ভোলানাথ। জটাজুটধারী, ভস্মচর্চিত জ্যোতির্ময় দেহ। হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছেন ভুবনেশ্বরীর কোলে উঠবার জন্যে।

ভুবনেশ্বরী তাঁকে কোলে নেবার জন্যে দু-বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাস্তব জগতে ফিরে এসে চোখ মেলে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। কোথায় সেই দেব? কোথায় সেই শিশু? সারাদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো তাঁর।

ভুবনেশ্বরীর সারারাত কাটলো সেই চিন্তায়।

তার পরের দিনগুলি প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতে লাগলেন এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি। এক অপার্থিব আনন্দ।

অতঃপর সেই পরমলগ্ন উপস্থিত হলো।

সকলের উদ্বেগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ভুবনেশ্বরী এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশু প্রসব করলেন।

পৌষমাস। মকর সংক্রান্তি। কৃষ্ণাসপ্তমীর পুণ্যতিথি।

ইংরাজী ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী জন্ম নিলো সেই যুগান্তকারী শিশু বিশ্ববন্দিত, ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ।

সেদিন কে জানতো এই শিশু একদিন মহামহীরূহ হয়ে ভ্রা , পুরানো-জীর্ণ, ভাঙ্গাচোরা সনাতন আর্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবে এক অভিনব রূপে?

শিশুকে দেখেই পরিচিত জনেরা বিস্মিত হলেন। চেহারা ও আকৃর্তি-প্রকৃতিতে হুবহু ওর ঠাকুরদা দুর্গাচরণের মত।

সকলে বললেন, শিশুর নাম রাখা হোক দুর্গাদাস। তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কন্তু ভুবনেশ্বরী বললেন, না ওর নাম হবে বীরেশ্বর। বীরেশ্বর শিবের কাছেই মানত করে পেয়েছি ওকে।

অতএব বীরেশ্বরই নাম রইলো

তারপর অন্নপ্রাশনের দিন বীরেশ্বরের নতুন নামকরণ হ'লো নরেন্দ্রনাথ। এটা হবে পোষাকী নাম। তাই নামটাও থাকবে তোলা। তার স্থান অধিকার করলো সেই পুরানো নাম বীরেশ্বর।

তারপর লোকের মুখে মুখে বীরেশ্বর ক্রমশঃ বীরে এবং সবশেষে

বিলে নামে এসে দাঁড়ালো। এই বিলে নামেই পরিচিত হ'লো সকলের কাছে।

বিলে দিন দিন বাড়তে থাকে। দুরন্তপনাও বাড়ে সমান গতিতে। ক্রমশঃ নালিশ এসে পৌঁছাতে লাগলো ভুবনেশ্বরীর কানে। তিনি ভেবে পান না কি করবেন। অন্য কেউ শাসন করতে গেলে উল্টো বিপদ। এমন আজব কাণ্ড করবে বিলে, যে, যারা শাসন করতে আসে তারা দিব্যি গেলে চলে যায়।

একদিন ভুবনেশ্বরীও ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। ছেলেকে কিছুতেই শাসন করা যায় না। দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সকলের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শান্ত করতে পারেনি বিলেকে।

হঠাৎ ভুবনেশ্বরীর কি মনে হতে বিলের মাথায় ঘটি থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন আর মুখে বললেন—শিব, শিব, শিব!

ঠিক যেন আগুনে জল পড়লো। দপ্ করে নিভে গেল। একেবারে শান্তশিষ্ট শিশুটির মত চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগলো চারিদিকে, যেন অনেক পরিচিতের মধ্যে পরিচিত কাউকে খুঁজে ফিরছে। যেন বহুকাল পরে ভুলে-যাওয়া কোনো অতিবড় আপনজনকে মনে পড়েছে। দেখে সকলে তো অবাক। ভুবনেশ্বরীরও চোখের পলক পড়ে না।

তাহলে কি সেই পরমযোগীর সন্ন্যাসীর নামেই বিলের এই ভাবান্তর?

ভুবনেশ্বরীর মনের মধ্যে সন্দেহের দোলা দুলতে থাকে।

তাহলে শেষ পর্যন্ত কি বিলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?

মাতৃহৃদয় কেঁদে ওঠে আশঙ্কায়। অবশেষে সকল কারণের কারণ যোগেশ্বরের চরণেই মনে মনে অর্পণ করেন ছেলেকে।

॥ দুই ॥

বিলের দুরন্তপনা কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। কিন্তু ভুবনেশ্বরীও যেন আসল মন্ত্রটি পেয়ে গিয়েছেন। যেমন বিলের তাণ্ডব শুরু হয় অমনি ভুবনেশ্বরী শিব নামের জলের ছিটে দেন।

কখনো বলেন,—বিলে, তুই যদি এমনি পাগলামি করিস, তাহলে আর তোর কৈলাশে যাওয়া হবে না।

সে কি? কৈলাশ যেতে না পারার চিন্তায় বিলের মুখ শুকিয়ে যায়।

বিরক্ত হয়ে দিদিরা একমুঠো ছেঁড়া চুল নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়ঃ এই দেখ মা তোমার ছেলের কাণ্ড। আমাদের চুলগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেললো।

ভুবনেশ্বরী বিরক্ত হয়ে বললেন,—ওর সাথে আর পারিনে বাপু। তোরা পারিস তো ধরে-বেঁধে রাখগে।

সত্যি সত্যি দিদিরা ছুটলো তাদের দুরন্ত ভাইকে বেঁধে রাখবার জন্য। কিন্তু কে কাকে ধরে! হাওয়ার গতিতে ছুটে গিয়ে নর্দমার পাশে আঁস্তাকুড়ের উপর গিয়ে দাঁড়ালো বিলে।

দিদি বেচারীদের সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। তারা থমকে দাঁড়ালো ওপাশে।

দিদিদের হারিয়ে দিয়ে বিলের আনন্দ ধরে না। বিদ্রূপ করে বলে,—কই ধর্ না এবার, দেখি কত বাহাদুর তোরা।

বিশ্বনাথবাবুর বাড়ীতে সাধু-সন্ন্যাসীদের যাওয়া-আসা প্রায়ই থাকে।

তাঁদের কাছে বিলে শিবের গল্প শোনে মন দিয়ে। শুনতে শুনতে তার মন চলে যায় কোন এক অজানা দেশে।

সেদিন ভুবনেশ্বরী অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন বিলে কোত্থেকে এক টুকরো গেরুয়া কাপড় জোগাড় করে সেটাকে কৌপিনের মত জড়িয়ে পরমানন্দে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—এ কি পরেছিস বিলে? জিজ্ঞাসা করেন ভুবনেশ্বরী।

—আমি শিব হয়েছি মা।

বলেই দুহাত তুলে নাচতে আরম্ভ করে দিল। সে নাচ আর থামে না।

এমন সময় পাড়ার একজন বৃদ্ধা এসে বিলের কাণ্ড দেখে হেসেই খুন। তারপর বললেন,—দাদু, তোর মাথায় জটা কই? শিবের মাথায় তো ইয়া লম্বা জটা থাকে।

বিলে এবার যেন বিপদে পড়লো। বৃদ্ধা আবার কৌতুক করে বললেন,—মুনি-ঋষিদের মত ধ্যান না করলে কি মাথায় জটা হয়?

মনে মনে ধ্যান করবার বাসনা জেগে উঠলো বিলের। কিন্তু ধ্যান কি জিনিষ, কেমন করে তা করতে হয়, তার কিছুই যে তার জানা নেই।

খানিকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর নিজেই আবিষ্কার করলো কেমন করে ধ্যান করতে হয়।

আর দেরী নয়। একটা নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে আসন পেতে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসলো গিয়ে।

কিন্তু মনের কৌতূহল যাবে কোথায়?

মাঝে মাঝে চোখ খুলে পিছনের দিকে ফিরে দেখে জটা মাটি ছুঁতে আর কতো বাকী। কিন্তু না, মাটি ছোঁয়া তো দূরের কথা, একটুও গজায়নি পর্যন্ত। এমনি করে বহুক্ষণ কেটে যাবার পর অভিমানে মার কাছে এসে কেঁদে ফেলল,—মা, এতক্ষণ ধ্যান করলাম, একটুও জটা বেরোল না।

ভুবনেশ্বরী তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিলেকে কোলের মধ্যে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—পাগল ছেলে, তার জন্যে কাঁদবার কি হয়েছে? একটু সময় ধ্যান করলে কি জটা বেরোয়? অনেক দিন ধরে ধ্যান করতে হয়। যাক, এখন খাবে চল।

কথাটা বুঝতে পেরেছে এমন ভাব দেখিয়ে চুপ করলো বিলে।

নতুন জামা-কাপড় পরে সমবয়সী সাথীর সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে বিলে।

এমন সময় দেউড়িতে এক সাধু এসে দাঁড়ালো। সাধুর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বিলের উপর। অবাক হয়ে, যেন সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইলো সাধু। খানিকক্ষণ এমনি করে কাটাবার পর সাধুর চৈতন্য হলো। তারপর সাধু বললো,—মহারাজ বনে গা খোকাবাবু। সাধু হাপনের কাছে কুছু ভিখ চাইছে।

বলে হাত পাতলেন সাধু। কিন্তু বিলে কি দেবে তাঁর হাতে? দেবার মত যে তার কাছে কিছুই নেই।

হঠাৎ মনে পড়লো, আছে। সাধুকে দেবার মত কিছু একটা নিশ্চয় আছে তার কাছে। তখুনি তার পরনের সেই সাধের নতুন কাপড়খানা খুলে সাধুর হাতে তুলে দিল। সাধুর আশ্চর্যের সীমা রইলো না। আর পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠলো দাতার মন। পরমানন্দে সেই ক্ষুদ্র দান মাথায় জড়িয়ে সাধু প্রস্থান করে।

কথাটা সকলের কানে গেল। ভুবনেশ্বরীও শুনলেন। শুনলেন বিশ্বনাথবাবুও। তিনি কর্মব্যস্ত মানুষ। এমনি অনেক ঘটনাই তাঁর কানে আসে, তবু আজও কিছু ব্যবস্থা করলেন না তিনি। সকলকে ডেকে শুধু বলে দিলেন,—সাধু-সন্ন্যাসী এলে ওকে কাছে যেতে দিও না।

কিন্তু কার সাধ্য তাকে চোখে চোখে রাখবে!

সুযোগ পেলেই কাউকে না কাউকে যা পাবে হাতের কাছে তাই দান করে বসবে।

অবশেষে ভুবনেশ্বরী একদিন একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন বিলেকে। বাইরে থেকে দরজায় দিলেন তালা লাগিয়ে। আর আদেশ দিলেন সকলকে, কেউ যেন দরজা না খোলে।

ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে চুপ করে ভাবতে থাকে বিলে।

জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দূরে লক্ষ্য করে দেখে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছিন্নবাস জীর্ণদেহ এক ভিখারী বালক।

অমনি তাকে ইশারা করে ডাক দেয়।

বালকটি এগিয়ে আসে জানালার কাছে। অমনি সে ঘরের যা কিছু পেল টেনে টেনে এনে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে লাগলো। দেখাদেখি আরো কয়েকজন ভিখারী এসে জুটলো জানালার নিচে।

বিলেও প্রাণভরে দামী দামী জামা-কাপড়, বাসন-কোসন যা পেলো সব জানালা দিয়ে বিলিয়ে দিলো তাদের। তারাঁও প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে করতে সরে পড়ে।

একটা ঝি হঠাৎ ব্যাপার দেখে বাড়ীতে গিয়ে জানায়। ভুবনেশ্বরী ছুটে এসে ঘরের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

রামচরিত কথা পাঠ কবতে করতে রহস্যভরে কথকঠাকুর বললেন,—মহাবীর হনুমান কলা খুব ভালবাসেন, তাই কলাবাগানেই বাস তার।

--তাই নাকি? জিজ্ঞাসা করে বসলো বিলে। মনের আগ্রহ আর চেপে রাখতে পারে না। আবার জিজ্ঞাসা করে,—সত্য কি মহাবীর কলাবাগানে থাকতেন?

শিশুর মনে অদম্য কৌতূহল দেখে কথকঠাকুরও বললে,—হ্যাঁ, নিশ্চয়। কলাবাগানে বসে ধ্যান করলেই পাওয়া যায় তার দেখা।

আব যায় কোথা! কাউকে কিছু না বলে বিলে চললো কলাবাগানে। বাগানে গিয়ে একটা জায়গায় আসন করে ধ্যানে বসলো। একাগ্র মনে ধ্যান করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। তবুও আসেন না হনুমান-মহাবীর।

দারুণ-ব্যথায় বিলের মন টন টন করে। দুঃখে ও অভিমানে চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এসে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে আরও কাঁদতে থাকে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন ভুবনেশ্বরী,—কি হয়েছে সোনা আমার?

বিলে বললো সব কথা।

কিন্তু স্নেহময়ী, বুদ্ধিশীলা ভুবনেশ্বরী শিশুমনের বিশ্বাসকে অবমাননা না করে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দিয়ে বলেন,—তাতে কাঁদবার কি হয়েছে, মহাবীরের কি বিশ্রাম করবার সময় আছে? শ্রীরামচন্দ্রের কাজে, কোথায় কোথায় দৌড়ে বেড়াতে হয় তাঁকে। সময় পাননি বোধ হয়। আর একদিন না হয় আসবেন।

চমৎকার কথা। মায়ের কথাই ঠিক। সন্দেহের মেঘ কেটে গেল বিলের মনের আকাশ থেকে।

রামসীতার উপর অগাধ ভক্তি।

একদিন এক সাথীকে সঙ্গে করে কোত্থেকে রামসীতার এক যুগলমূর্তি কিনে নিয়ে এলো। তারপর চিলেকোঠার ছাদে গিয়ে দুই বন্ধু ধ্যান করতে বসলো সঙ্গীটির মাঝে মাঝে চোখ খুলে যায়, কিন্তু বিলের কোন সাড়াশব্দ নেই। অনেক কাণ্ড করতে তবে তার সাড় হয়।

এ হেন শ্রদ্ধার উপরেও আঘাত পড়ল একদিন।

বিশ্বনাথবাবুর ঘোড়াশালের সহিসের কাছে বিলের খুব যাতায়াত ছিল। সহিসও খোকাবাবুকে পেলে নানা প্রকার আজগুবি গল্প শোনাত। তাই সহিসের উপর বিলের ছিল অগাধ বিশ্বাস। সহিত যা বলতো তা যেন বেদবাক্য।

সহিস হয়তো তার নিজের দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারেনি। তাই কথার ছলে বিলেকে বললো,—খোকাবাবু, জীবনে যদি সুখী হতে চাও তাহলে বিয়ে ক'রো না। বিয়ে করা ভারী অন্যায়, ভীষণ পাপ।

শিশুমনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইলো সেই কথাটি।

বললো বিলে,—আমি জীবনে কখনো বিয়ে করবো না।

সহিস তার পিঠ চাপড়ে বললো,—বাঃ চমৎকার! ঠিক আছে খোকাবাবু।

কিন্তু রামসীতা যে বিয়ে করেছেন? তার কি হবে?

যারা বিবাহিত তাদের পুজোই বা কেমন করে হবে। কিন্তু মা বলেন, সীতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা আদর্শ নারী। রামচন্দ্র পুরুষশিরোমণি। মায়ের কথা কি মিথ্যা ?

তা কি করে হবে ? তবে কি সহিস মিথ্যা বলেছে ? তাও ত হতে পারে না।

অতএব মার কাছেই জেনে নেওয়া যাক কোনটা সত্যি।

ভুবনেশ্বরী সব শুনে ভাবলেন,—"মূর্খের কল্পনাশক্তি হলে জাগরিত যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাবিত"। মুখে বললেন, তাতে কি হয়েছে বাবা, যিনি যেমন আছেন তেমন থাকুন। তোমার যদি ইচ্ছা হয় শিবের পুজো করো।

ব্যস। মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য। তাছাড়া শিব আর সন্ন্যাসীদের উপর আগে থেকেই একটু বেশি মাত্রায় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিলই, তাই পরদিনই বাজার থেকে শিবমূর্তি কিনে আনলো।

তারপর শুরু হলো আবার ধ্যান-পূজো।

কখনো একা, আবার কখনো বা সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ধ্যানে বসে।

অন্যান্য ছেলেদের মন চঞ্চল। ধ্যানে মন বসে না। কিন্তু ধ্যানে বসলে বিলের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়।

একদিন তেমনি দল বেঁধে ধ্যান করতে বসেছে সকলে।

যেন বালখিল্য ঋষির দল ধ্যানে বসেছে। সকলের চোখ বন্ধ।

জায়গাটাতে মশার উপদ্রব ছিল খুব বেশি। অন্যান্য সাথীরা মশার কামড়ে উঃ আঃ করছে! বার-বার চোখ খুলে যাচ্ছে তাদের। কিন্তু বিলের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার গায়ে অসংখ্য মশা বসে ছেয়ে গেছে যেন দেহ।

হঠাৎ ছেলেদের মধ্যে একটা ভয়ের চীৎকার উঠলো। তারা দেখে বিরাট এক বিষধর সাপ ফণা তুলে এদিকে এগিয়ে আসছে।

তারা চীৎকার করে উঠলো,—এই বিলে, পালা! সাপ আসছে, সাপ!

বিলের এতটুকু সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ধীরস্থির হয়ে বসে আছে তো আছেই।

ছেলেরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। গিয়ে ভুবনেশ্বরীকে খবর দিল।

ভুবনেশ্বরী ছুটে এসে দেখেন, বিরাট একটা সাপ ফণা তুলে বিলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে। তার হিংস্র কুটিল চোখ দুটি যেন আগুনের মত জ্বলছে। শব্দ করছে ফোঁস্ ফোঁস্ করে আর জিভ বার করছে লক্ লক্ করে।

এদিকে সন্ধ্যা উতরে যায় যায়। নিরুপায় পিতামাতা গলবস্ত্র হয়ে ঈশ্বরকে ডাকলেন,—আমাদের সন্তানকে রক্ষা করো প্রভু!

তারপর এক সময় সাপটি ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেল তার নিজের জায়গায়।

ভুবনেশ্বরী বিলেকে ধাক্কা মেরে জাগালেন,—বলি, এমনি করে কোনদিন যে মারা যাবি! বাপরে বাপ্ এক্ষুনি যে সাপে শেষ করতো তোকে!

বিলে যেন ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ। চোখ মুছে চারিদিকে তাকিয়ে বললো,—কই, কোথায় সাপ? আমি ত কিছু জানি না।

ধীরে ধীরে বিলের বয়স বাড়তে থাকে।

বিশ্বনাথবাবু বিলের শিক্ষার জন্য বাড়াতেই একটা অবৈতনিক পাঠশালা খুলে দিলেন। কিন্তু কে কাকে পড়াবে? গুরুমশাইকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তোলে বিলে। অদ্ভুত সে-সব প্রশ্ন।

এই সুযোগে সঙ্গীও জুটেছে অনেক। বিলে হয়েছে তাদের নেতা। তারাও সানন্দে মেনে নিয়েছে তাদের দলপতিকে।

নেতা ক্ষুদ্র হলে কি হবে, তার প্রভাব ক্ষুদ্র নয়। সকল সাথীকে যেমন প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে, তেমনি কড়া শাসনও করে।

খেলার সময়ও তার হুকুম মানতে হবে সকলকে।

কেউ সাজবে রাজা, কেউ মন্ত্রী, কেউ বা নগরপাল।

আবার কেউ বা কুলী, কেউ মিস্ত্রী আর কেউ সাজে ইঞ্জিনীয়ার।

লেখাপড়ার বিষয়ে বিলের মেধা ছিল আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত. অসাধারণ।

বাড়ীতে যে গুরুমশাই পড়াতেন, তাঁর সামনে দিব্যি চোখ বুজে শুয়ে থাকত বিলে। আর গুরুমশাই সেদিনের পড়া অনর্গল বলে যেতেন।

আশ্চর্যের বিষয়, সেই পড়া সম্বন্ধে পরে যে-কোন দিন, যে-কোন সময়ে, যে-কোন দিক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বিলে তার নির্ভুল উত্তর দিতো।

বিশ্বনাথবাবুর বৈঠকখানায় নানা জাতির মক্কেল আসে। তাদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন হুঁকো সাজানো থাকে।

বিলে ঘরে ঢুকে চাকরকে জিজ্ঞাসা করে,—এতগুলো হুঁকো কেন?

চাকর উত্তর দিল,—এক এক জাতির লোকের এক একটি হুঁকো। এক জাতির হুঁকোয় অন্য জাতির লোকের মুখ দিতে নেই।

কিন্তু তাতে কি কিছু ক্ষতি হয়? অথবা কেউ মারা যায়? না— বিপদ ঘটে কিছু? নানা রকম প্রশ্ন জাগে বিলের মনে। আবার সে বলল,—আমি তো হিন্দু কায়স্থ, মুসলমানের হুঁকোয় টান দিলে কি আমার বিপদ হবে?

চাকর বলে,—তা জানি না বাবু।

আর কথার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সুযোগ বুঝে আবার ঘরে এসে ঢোকে বিলে। কেউ তখন ঘরে নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটার পর একটা হুঁকোয় টান দিতে লাগল। মুসলমানের হুঁকোয় কয়েকটা বেশি টান দিয়ে দেখলে বেশী বিপদ হয় কি-না।

কিন্তু কই? জাত না মানলে তো বিপদ হয় না।

চড়কের মেলা দেখে ফিরছে বিলে। একজন সঙ্গী আছে সঙ্গে।

ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আনমনে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। সঙ্গীই খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে পিছন ফিরে দেখল বিলে। একটা ঘোড়ার গাড়ি তীরের মত ছুটে আসছে। কিন্তু বিলের বন্ধু ঘাবড়ে গিয়েছে, একটু হলেই গাড়ির তলায় চাপা পড়বে।

চিন্তা করবার সময় নেই। বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে বিলে একেবারে ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে বন্ধুকে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে সরিয়ে নিয়ে এলো।

আশপাশের লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। যেন একটা ভোজবাজী হয়ে গেল। কেউ বুঝতে পারলো না কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

বাড়িতে ভুবনেশ্বরী ভেবেই আকুল।

কিছুক্ষণ পরে বিলে অক্ষত শরীরে মহাদেবের একটা মূর্তি বগলে করে ফিরে মায়ের কোলে বসে বলল সব কথা। ভুবনেশ্বরী প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন বিলেকে।

॥ তিন ॥

দিন দিন বয়স বাড়ছে। পাঠশালায় আর পড়া চলে না।

মেট্রোপলিটনে ভর্তি হলো বিলে। কিন্তু ইংরাজী সে কিছুতেই পড়বে না। এ বি সি অক্ষর দেখলে যেন বমি আসে। বিদেশী ভাষা শিখে লাভ কি হবে?

নানা জনে নানা কথা বলতে থাকে।

আচ্ছা, তাহলে পড়েই দেখা যাক। শুরু হল ইংরাজী।

আরম্ভ হলে আর তাকে ঠেকায় কে? তর তর করে এগিয়ে যায় সমবয়সীদের চেয়ে অনেক আগে।

স্কুলে কিন্তু বিলে তার পোষাকী নাম নরেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত।

বয়সে ছোট অথবা বড় নরেনের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের কাছে সকলে বশীভূত। তাছাড়া ওকে ভয়ও করে চলতে হয় সবাইকে।

যেমন দল সংগঠনে তেমনি খেলাধূলায় নরেনের দল সকলের আগে, আর সকলের আগে নরেন।

দলের সকলকে হাত দেখিয়ে বললো নরেন,—বলতো, বড় হলে আমি কি হবো?

সাথীরা অবাক হয়ে চুপ করে থাকে।

—বড় হলে আমি সন্ন্যাসী হবো। এই দেখ সাধু হবার রেখা। যার তার হাতে থাকে না এসব রেখা।

কে একজন সাথী বলে—সাধুরা কি করে?

—ধ্যৎ! তোরা কিছুই বুঝিস না। তাচ্ছিল্যের সুরে বললো নরেন, বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসীরা হিমালয় পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু যে চূড়াটা আছে, সেইখানে থাকে। সেখানে রোজই তাদের সঙ্গে দেখা হয় শিব ঠাকুরের সঙ্গে।

দুরন্তপনায় নরেনের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না কোনো

ছেলে। কিন্তু পাড়ার প্রত্যেকের সঙ্গে তার স্নেহ-প্রীতির বন্ধনও অবিচ্ছেদ্য।

বাড়ি থেকে খানিকটা দুরে এক সহপাঠীদের বাগানে ছিল একটা চাঁপাগাছ। সময় পেলেই নরেন চলে যায় সেই চাঁপাগাছে দোল খাবার জন্যে।

দোল খাওয়া আবার যেমন তেমন নয়। পা দুটোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মাথা নিচু করে ঘন্টার পর ঘন্টা দোল খেয়ে চলেছে নিশ্চিন্তভাবে।

হঠাৎ চোখ পড়লো বন্ধুর ঠাকুরদার। তিনি নরেনের দুঃসাহসিকতা দেখে আঁৎকে ওঠেন। কাছে এসে নরেনকে অনুরোধ করে নামিয়ে এনে বললেন,—এই গাছে বিরাধ এক ব্রহ্মদৈত্য থাকে। একটু ফাঁক পেলেই ঘাড় মট্‌কে দেবে। আর কখনো গাছে চড়িস না।

ঠাকুরদার সামনে চলে আসে নরেন। বৃদ্ধ ভাবলেন, ভয় দেখানো ছাড়া অমন দুরন্ত ছেলেকে বাগে আনা সম্ভব নয়। আর আসবে না দোলনা খেতে।

কিন্তু বৃদ্ধ যেই পিছন ফিরেছেন অমনি নরেন আবার গাছে চড়ে বসে। ব্রহ্মদত্যি জীবটা কেমন না দেখে ত বাড়ি ফেরা যায় না। দেখাই যাক কে কার ঘাড় মটকায়!

অর্থাৎ যা চোখে দেখিনি তার অস্তিত্ব বিশ্বাস করা যায় না। লোকে বললো আর তাই বিশ্বাস করতে হবে, এমন বোকা নয় নরেন্দ্রনাথ। অতএব দোল খাওয়া চলতে থাকে আগের মতই।

তার কয়েকদিন পর সেই বন্ধুর ঠাকুরদার চোখে পড়ে যেতে তিনি বললেন,—তুমি বুঝি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সারাদিন এমনি দুষ্টুমি করে বেড়াও?

গাছ থেকে নেমে এসে নবেন বলে,—তা কেন, আমি আগে পড়া করি, তারপর অন্য কাজ।

—লেখাপড়া করো? বেশ, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তো, দেখি কেমন শিখেছ?

ভদ্রলোক একের পর এক পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্ন করতে লাগলেন আর নরেন তার কথা শেষ হবার আগেই উত্তর দিচ্ছে। ভদ্রলোক দেখলেন এ ছেলেকে অন্য উপায়ে নিরস্ত করতে হবে। তিনি বললেন, —তা বেশ ভালই শিখেছ, কিন্তু তোমার আরো বেশি শেখা দরকার। আরও একটু মন দিয়ে শেখো।

এবার মাথা নিচু করে চলে যায় নরেন। আর কখনো সেখানে আসেনি।

বন্ধুদের আগ্রহে দল বেঁধে চললো মেটেবুরুজ। সেখানে আছে এক পশুশালা। দেখেশুনে ফিরবার সময় নৌকোর মাঝির সঙ্গে লাগলো গণ্ডগোল।

দলের একজন সাথী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নৌকোর উপর বমি করে ফেলেছে। মাঝিরা ত আগুন। নৌকো ধুয়ে দিতে হবে, নইলে কাউকে তারা নামতে দেবে না। ছেলেরা বললো,—আমরা ডবল ভাড়া দিচ্ছি, তোমরা পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করে দাও। কিন্তু মাঝিরা নারাজ। উল্টে গালাগালি করতে লাগলো তারা, তারা ভয়ও দেখাল নদীতে ফেলে দেবার।

ছেলেরা বেশ ভয় পেয়ে গেল। এদিকে মাঝিরা নৌকা ঘাটের খানিকটা দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

নরেন দেখলো দূরে রাস্তার উপর দিয়ে কয়েকজন গোরা সৈন্য যাচ্ছে। ওদের কাছে সাহায্য চাইলে কেমন হয়। এমন সময় মাঝিদের অসাবধানতায় নৌকাটা গেল ঘুরে আর সেই সুযোগে একলাফে নরেন পাড়ে গিয়ে উঠলো। তার পরই এক ছুটে সেই গোরা সৈন্যের কাছে গিয়ে কোনো প্রকারে ভাঙ্গা ইংরাজীতে শুদ্ধ অশুদ্ধ ভাষা মিলিয়ে জানালো তাদের বিপদের কথা।

ছোট ছেলেটির সাহস দেখে সাহেবরা খুব খুশী। তারা এলো নরেনের সঙ্গে নৌকার কাছে।

মাঝিদের তখন চোখ কপালে উঠে গেছে। কি জানি গোরা সৈন্যরা কি করে বসে।

পলটনী সাহেব এসে হাতের বেত উঁচিয়ে মাঝিদের ধমক দিতে মাঝিরা বার-বার সেলাম করে আর এক একজনের হাত ধরে যত্ন করে নামিয়ে দেয় ছেলেদের। যাবার সময় সাহেবরা আনন্দে নরেনকে উদ্দেশ্য করে বলে,—গুড বাই মাই ডিয়ার বয়!

নরেনও হাত তুলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে,—গুড বাই!

এমনি করে কাটতে থাকে নরেন্দ্রনাথেব দিন।

বয়েস মাত্র এগার। কিন্তু দুরন্তপনায় একুশ বছরকে হার মানায়।

তবে মাতৃভক্তির তুলনা মেলা ভার। ভুবনেশ্বরী যতই ভাবেন ততই খুশী হন। মায়ের নির্দেশ অলঙ্ঘ্য নরেনের কাছে। মাও তাই শিক্ষা দেন ছেলেকে, যাই করো বাবা, জীবনে যা সত্য, যা ন্যায়, তাকেই মেনে নেবে। কর্তব্যের প্রতি কখনো বিরূপ হবে না, আর কখনো অশান্ত আর উদ্ধত হয়ো না। সত্যের জন্য হয়তো অনেক সময় ব্যথা পেতে হতে পারে, তবুও তাই মেনে নেবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে।

মায়ের উপদেশ একদিনের জন্যেও ভোলেনি নরেন্দ্রনাথ।

স্কুলে একটি ছেলে পড়া না পারার জন্যে শিক্ষক মশাই তাকে বেদম মারছেন। নরেনের বুকে বাজালো সে বেদনা। কিন্তু শিক্ষক মশাইকে বলাও ধৃষ্টতা। তাই খানিক চুপ করে থেকে নরেম হেসে উঠলো হো-হো করে।

ব্যস! আর যায় কোথা। শিক্ষক মশাইয়ের সব রাগ এসে পড়লো নরেনের উপর। আব তখনই নরেনের চুলের মুঠি ধরে মারতে থাকলেন। নরেন নীরব নির্বিকার হয়ে মার খায় আর শিক্ষক মশাইয়ের রাগ ততই বেড়ে যায়। অতঃপর তিনি নরেনের কান ধরে মারলেন ভীষণ জোরে এক টান। তাতে কানের খানিকটা কেটে ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরতে লাগলো।

এবার নরেন চুপ করে থাকতে পারে না। বাঘের মত গর্জন করে উঠলো,—সাবধান বলছি, আর মারবেন না। এমন করে মারবার কোনো অধিকার নেই আপনার।

বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মশাই। হঠাৎ তাঁর কানে নরেনের কথা যেতে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে নরেনের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সামনে এসে নরেন নিজের অবস্থা দেখিয়ে বললো,—দেখুন স্যার, আমার কি অবস্থা করেছেন। এর প্রতিকার না হলে আমি এ স্কুল ছেড়ে দেব।

কোমলপ্রাণ বিদ্যাসাগর চমকে ওঠেন। শিক্ষকের কাছে গিয়ে বললেন,—তুমি মানুষ না পশু? শিক্ষকের কর্তব্য না বুঝেই শিক্ষকতা করতে এসেছ? এটা কি খুন করার জায়গা? আজ তোমাকে সাবধান করে দিলাম। আর কোনদিন যদি তোমার ব্যবহারে, কোন ত্রুটি দেখি সেই দিনই তোমাকে তাড়িয়ে দেব।

তারপর নরেনের গায়েও তাঁর স্নেহশীল হাত বুলিয়ে দিলেন। সেই স্পর্শে নরেনের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল যেন। সেও শান্ত-শিষ্ট হয়ে ক্লাসে গিয়ে বসলো। ছেলেরা বুঝলো নৈতিক সাহস কাকে বলে।

হঠাৎ কারো চাকরি নষ্ট করতে বিদ্যাসাগরের মায়া লাগতো, তাই শিক্ষক মশাই সে-যাত্রা রক্ষে পেলেন।

মেট্রোপলিটন স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সেবার সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন পূজ্যপাদ দেশপ্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভাতেই একজন বিদায়ী শিক্ষককে ছাত্ররা সম্বর্ধনা জানাবে।

কিন্তু সম্বর্ধনা সম্পর্কে কিছু না বললে ব্যাপারটা খুবই খারাপ দেখায়, অথচ সারা স্কুলে এমন কেউ নেই যে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাহস করে বক্তৃতা দেবে।

এমন সময় এগিয়ে এলো নরেন্দ্রনাথ।

যথারীতি সভাপতিকে অভিবাদন জানালো। তারপর পরিষ্কার ইংরাজীতে পাকা আধ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করলো। উপস্থিত সকলে

অবাক হয়ে গেলেন নরেনের বাগ্মিতার পরিচয় পেয়ে। স্কুলের ছেলেরা নরেনকে জড়িয়ে ধরে বললো,—সত্যিই নরেন, তোর জন্যে আজ আমাদের স্কুলের মান রক্ষা হলো।

স্কুল ছেড়ে কলেজ। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলো নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু বেশিদিন এখানে পড়াশুনা চললো না। পরের বৎসর ভর্তি হলো জেনারেল এসেমব্লিজ এসোসিয়েসনে।

এখানে পড়াশুনায় বেশ মন বসে। ইংরাজী ভাষায় তার দখল অদ্ভুত। ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়া এবং বাক্যালাপ করায় নরেন্দ্রনাথ তার সহপাঠী এবং উঁচু ক্লাসের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে যায়।

শুধু যে বিদ্যাশিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ সকলকে ছাড়িয়ে গেল তা নয়। হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক-রঙ্গপ্রিয়তায়ও নরেন ছিল সবার সেরা।

শরীর গঠন অর্থাৎ ব্যায়াম ও খেলাধুলার দিকে তার অনুরাগ চিরকালই ছিল। তাছাড়া সঙ্গীত-চর্চা, নাট্যাভিনয়ে নরেন বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলো। বড় বড় ওস্তাদের কাছ থেকে নানা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষ শিক্ষালাভ করেছিল। এমন কি, বন্ধু-বান্ধবেরা নরেনকে দেখলেই আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠতো, ঐ রে, নরেন এসেছে। ক্লাসের মধ্যেই বন্ধুরা চেপে ধরে গান গাইবার জন্যে। নরেন বলে,—তা কি করে হয়? প্রফেসর আসবে যে!

কিন্তু বন্ধুরা নাছোড়বান্দা।

অগত্যা নরেনকে গাইতে হয়। তার সুধামাখা কণ্ঠের সুর যে একবার শুনেছে সে আর ভুলতে পারেনি।

তাছাড়া নৃত্যকলায়ও নরেনের খুবই সুনাম ছিল। তবে তার নৃত্য ছিল উচ্চাঙ্গের ভাবসমৃদ্ধ বীরনৃত্যের এক বিস্ময়কর শিল্প।

কাউকে খুব প্রসাধন করতে দেখলে নরেন ঠাট্টা করে বলত,—কি রে, মেয়েমানুষ হবি নাকি? দেখ, পুরুষ হয়ে জন্মেছিস, পুরুষের মত হয়ে বেঁচে থাক। মেয়েছেলেদের মত প্রকৃতির বশে কাপুরুষ হয়ে থাকিস না।

কলেজ জীবন থেকেই নরেন্দ্রনাথের জীবনে পরিবর্তন শুরু হয়।

পৃথিবীর নানা দেশের, নানা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস পড়তে পড়তে তার মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগলো।

বিশেষ করে দর্শনশাস্ত্রের উপর তার অনুরাগ ছিল। দেশবিদেশের বড় বড় মনিষীদের বিখ্যাত বইগুলি পড়ে, সেগুলির সব জটিল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে, চাইতো তার মূলসূত্র।

এই দর্শনের মধ্য দিয়েই নরেনের মনে এক নবীন চিন্তাধারা প্রবাহিত হতে শুরু করলো। ক্রমশঃ তার মনের মধ্যে জ্ঞান-অর্জনের পিপাসা তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠল। তার মনে সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা হলো,—এ জগৎটা কি? কোথায় এর আদি আর কোথায়ই বা এর অন্ত? কি আছে এই জগতের অন্তরালে? এই অনন্ত অসীম বিশ্বরাজ্য কি কোন অদৃশ্য নিয়ন্তা কর্তৃক পরিচালিত? মানুষ আসে আর চলে যায়। এই জন্ম আর মৃত্যু, যাওয়া-আসা, এব উদ্দেশ্য কি? জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকগণ ঈশ্বর বলে যা প্রচার করেছেন, আসলে ঈশ্বর বলে কোন জিনিষ কি সত্যই আছে? কেউ কি দেখেছে ঈশ্বরকে? না শুধু ধর্মপ্রচারকদের ধোঁকাবাজী সব?

অমনি অজস্র চিন্তা ভীড় করতে থাকে নরেনের মনের মধ্যে। কিন্তু বাইরে তা বুঝবার উপায় নেই। অন্যান্য কাজকর্ম, লেখাপড়া, হৈ-হুল্লোড় সব কিছুই চলতে থাকে আগের মত।

বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর এক গৌরবময় যুগ। একটা শতাব্দীতে কোন জাতির মধ্যে এতগুলি মনিষীর আবির্ভাব একটা দেখা যায় না। নিঃসন্দেহে এই যুগকে স্বুবর্ণ-যুগ বলা যায়।

বাংলার প্রতিভাকাশে যুগসূর্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বর্তমান।

নরেন্দ্রনাথের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে সত্যকে জানবার জন্য।

কিন্তু কে দেবে তাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান? বাংলা তখন ভীষণ

ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে এক মহাপরিবর্তনের দিকে।

ধর্মে, সাহিত্যে, সমাজসংস্কারে, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে চলেছে বিরাট এক আলোড়ন এবং আন্দোলন।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাংলার মাটিতে খ্রীষ্টধর্মকে বদ্ধমূল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের চেষ্টায় বাংলার জনগণের মনের জোর অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে এবং তাঁরা অনেকাংশে সাফল্যলাভ করেন।

ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু যুগপ্রবর্তকের আবির্ভাব ও সক্রিয় হস্তক্ষেপে সময়ের মোড় ঘুরলো।

রামমোহন রায় দেশের অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বেদান্তের সারমর্ম নিয়ে এক নতুন ধর্মেব প্রবর্তন করেন। বিদ্যাসাগর মশাই এসে দাঁড়ালেন সমাজ সংস্কাবের পথে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী দিয়ে বেরিয়ে আসে সময়োপযোগী কথা-সাহিত্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর কেশবচন্দ্র ধর্মক্ষেত্রে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করলেন।

আর শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবধারা বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিল এক অপূর্ব চেতনার বীজ।

বাঙ্গালী এক নতুন আলো দেখতে পেলো। সরে এলো নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে।

কিছুদিন পর বিলাতে থাকাকালে রামমোহনের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মধর্মের বিস্তার ব্যাহত হয়নি, তবে প্রচারকদের মধ্যে মত-ভেদ ঘটায় সভা ভেঙ্গে তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ একের পর এক মনিষীদের কাছে ঘুরছে প্রকৃত সত্য কোথায় জানবার জন্য। সদুত্তর পাওয়া যায় না কোথাও। মাঝে মাঝে নিরাশ হয়ে পড়ে নরেন্দ্রনাথ। তবে কি সব মিথ্যা?

কিন্তু মিথ্যা বলে ভাবতেও মন চায় না।

দারুণ সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলো। তবে তিনটি ভাগের একটি ভাগ—সাধারণ ব্রহ্মসমাজ।

যথানিয়মে নবেন্দ্রনাথ উপাসনায় যোগ দিতে থাকে। সমাজের সকল বিধি-ব্যবস্থাও মেনে চলে। ব্যক্তিগতভাবে সকল প্রবর্তকের কাছে গিয়ে নানা আলোচনা কবতেও থাকে নরেন্দ্রনাথ, নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই প্রশ্ন করে, তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন কি না।

তেমনি একদিন গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বসে একটা জটিল বিষয় আলোচনা করতে করতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে সোজাসুজি প্রশ্ন কবে —তিনি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ কবেছেন কি-না।

হঠাৎ এই রকম প্রশ্ন শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন মহর্ষি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন,—না বৎস, আমি দেখিনি বটে, তবে তাঁকে অনুভব কবেছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তুমি সাধনা কবো, তুমিও দেখতে পাবে। তোমার দেহে যোগীব চিহ্ন দেখছি আমি। সাধনায় নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করবে তুমি।

মহর্ষির কথায় নরেনের মন দমে গেল। মুহূর্তে নিভে গেল যেন সমস্ত আশার আলো। তবে কি তার প্রশ্নের সমাধান আর কোনদিন হবে না?

সিমলে পাড়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন। সুরেন্দনাথ ঠাকুরের ভক্ত। ঠাকুর আসতে একটা ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তিনি।

ভাবের পাগল শ্রীরামকৃষ্ণ।

গান শুনতে ভীষণ ভালবাসতেন। কিন্তু যে সে গান নয়, মাতৃ-প্রেমের গান হওয়া চাই। ঈশ্বরপ্রেম থাকা চাই সে গানের মধ্যে।

সুরেন্দ্রনাথ একজন ভালো গায়কের সন্ধান করতে থাকেন।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় নরেনের কথা। নরেনই পারবে এ সমস্যায়

সমাধান করতে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়লো নরেনের। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই গেলেন।

কিন্তু নরেন তখন 'টঙে'।

নরেনের মাতামহীর বাড়ির দোতলার সিঁড়ির কাছে ছোট একটি নিরালা ঘরে থাকে নরেন। এখানে কোন কাজে ব্যাঘাত হয় না। একান্তমনে বসে কাজ করা যায়। তবে ঘরটা বড্ড ছোট বলে নরেন এর নাম দিয়েছে 'টঙ'।

ঘরের মধ্যে একটা ক্যাম্বিসের খাট আর একটা বালিশ। মেঝেতে একটা ছেঁড়া মাদুর। দড়িতে টাঙানো এক আধটা জামা বা ধুতি। আর ঘরের এক কোণে একটা তানপুরা, একটা বাঁয়া-তবলা আর একটা সেতাব। অন্য কোণে রয়েছে একটা হুঁকো আর হুঁকো সাজবার সরঞ্জাম।

সুরেন্দ্রনাথের ডাক কানে গেল নরেনের। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসতে সুরেনবাবু বললেন,—তোমাকে একবার আমার বাড়ি যেতে হবে।

নরেন সব শুনে আপত্তি না করে চলে এলো সুরেন মিত্তিরের বাড়ি। সেখানে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন অনেকের সঙ্গে প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

সভায় ঢুকতেই ঠাকুরের দৃষ্টি পড়লো নরেনের উপর।

কিন্তু একি! ঠাকুরের মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। কেমন যেন একপ্রকার অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করলেন ঠাকুর।

স্নেহবিগলিত কণ্ঠে ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—বসো, এইখানে বসো।

নরেনের দৃষ্টিতে কিন্তু ঠাকুরকে মনে হলো কেমন একরকম উদাসীন, কেমন যেন পাগল-ভাব বলে মনে হলো।

অগত্যা নরেন হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গান গাইতে বসে।

তার সুললিত কণ্ঠে ঝরে পড়ে ভগবৎ-প্রেম। তার অপূর্ব

ভাবরসের মূর্ছনায় মুগ্ধ হলেন সকল শ্রোতা। ভাবাপ্লুত ঠাকুরের চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

গান শেষ হতেই সাশ্রুনেত্রে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন সুরেনবাবুকে —এ ছেলেটি কে সুরেন? কার ছেলে?

পরিচয় পেয়ে ঠাকুর ভীষণ খুশী হলেন। বললেন,—বাঃ, খাসা ছেলে! এমনিটিই তো চাই।

তারপর নরেনকে বললেন,—একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসো না। এই তো কাছেই। যাবে তো? ভুলবে না?

ঠাকুরের আন্তরিক অনুরোধ এড়াতে না পেরে নরেন ঘাড় নেড়ে মৌনসম্মতি জানায়।

এদিকে পরীক্ষার জন্য নরেন বিশেষ ব্যস্ত ছিল বলে নানা কাজের মধ্যে ঠাকুরের কথা ভুলে গেল।

একদিন হঠাৎ নরেন শুনতে পেলো তার বাবা, মা ও অন্যান্য প্রিয়জনেরা নরেনের বিয়ে একরকম ঠিক করে ফেলেছেন। পাত্রী-পক্ষ নরেনকে পড়াশোনার জন্য বিলাত পাঠাতে ও নগদ দশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে রাজী হয়েছে।

শুনেই চমকে ওঠে নরেনের চির-বৈরাগ্য মন।

না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। বিয়ে করা মানেই তো নিজেকে চির-তমসার মধ্যে নিক্ষেপ করা। তাকে অনেককিছু জানতে হবে, শিখতে হবে।

আবিষ্কার করতে হবে অনন্ত রহস্যময় এই সৃষ্টি মহিমাকে, সৃষ্টিকর্তাকে।

মনের আবেগ চেপে রাখতে না পেরে একদিন রামচন্দ্র দত্তকে খুলে বললে সব কথা।

রামচন্দ্র দত্তও পরিষ্কার বলে দিল,—প্রাণের ক্ষুধার যদি শান্তি পেতে চাও, তাহলে সোজা দক্ষিণেশ্বরে চলে যাও। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেই পাবে তোমার সমস্যার সমাধান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব? দক্ষিণেশ্বরে?

মনে পড়লো নরেনের, পরীক্ষার আগে ঠাকুরকে নরেন কথা দিয়েছিল।

দেখাই যাক সেখানে একবার গিয়ে।

অতঃপর দিনকয়েক পর জনকয়েক বন্ধুকে নিয়ে নরেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গেল। তাকে দেখেই ঠাকুর আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে বলে উঠলেন,—আয়, আয়, আমি যে পথ চেয়ে বসে আছি। এত দেরী করে আসতে হয়? ওরে, বিষয়ী মানুষগুলোর সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার জিভটা যে জ্বলে গেল। আমার কথা কি একেবারে ভুলে থাকতে হয়?

ঠাকুরের এমনি অভ্যর্থনায় নরেন হতবাক।

তারপর নরেনকে কাছে বসিয়ে মোহাবিষ্টের মতো তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন,—আমি জানি প্রভু, তুমি কে। তুমি সেই পুরানো ঋষি, তুমি নররূপী নারায়ণ। জীবের কল্যাণের জন্য দেহধারণ করে এসেছো।

ঠাকুরের কাণ্ড দেখে নরেন আর তার বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল।

প্রথম দর্শনে ঠাকুরকে যে পাগল বলে মনে করেছিল নরেন, এবার সেটার উপর বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো।

তারপব ঠাকুর নিজের হাতে নরেনকে সন্দেশ, মাখন আর মিছরী খাওয়াতে আরম্ভ করেন। এবার যেন নরেন অস্বীকার করতে পারে না।

—আমার বন্ধুরা রয়েছে যে, বললো নরেন।

—ওরাও খাবে, আগে তুমি খাও, তারপর আর সকলে খাবে। বললেন ঠাকুর।

কিন্তু ওদের কথা আর ঠাকুরের মনে রইলো না। একটু একটু করে নরেনকে সবটুকু খাইয়ে দিলেন।

তারপর নিচু স্বরে বললেন,—দেখ, আর একদিন আসবি। সেদিন কিন্তু একাই আসবি। কাউকে সঙ্গে আনবি না।

এবারেও নরেন মাথা কাৎ করে সম্মতি জানালো। পারলো না উপেক্ষা করতে।

ঠাকুরকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না নরেন।

তবুও ঠাকুরের সেই জীবন্ত আকর্ষণকেও অস্বীকার করতে পারে না। পাগল হলেও তাঁর মধ্যে এমন একটা বিশেষ কিছু আছে যা নরেন ধরতে পারছে না।

সেদিন নরেন আবার এলো দক্ষিণেশ্বরে।

নরেনকে দেখে তক্তাপোশ ছেড়ে উঠে এসে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে নরেনের হাত ধরে নিজের পাশে বসালেন। তারপর বিড়-বিড় করে কি-সব বলতে লাগলেন।

নরেন ভাবে, এই সুরু হলো ঠাকুরের পাগলামি।

কিন্তু হঠাৎ নরেন যেন কিসের স্পর্শ অনুভব করে। ঠাকুর ডান পা দিয়ে নরেনকে স্পর্শ করেছেন। নরেনের শরীরের সকল শিরা-উপশিরায় যেন বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায়।

নরেনের চোখের সামনে সকল বিশ্ব-প্রকৃতি ভীষণ বেগে ঘুরতে ঘুরতে আকাশে মিলিয়ে যেতে থাকে। ও নিজেও যেন নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে—যেন মহাপ্রলয়ের মাঝে মিশে যাচ্ছে।

হঠাৎ নরেন সব শক্তিটুকু দিয়ে একবার চীৎকার করে ওঠে,—ওগো, আমাকে এ কি করলে তুমি! আমার যে মা বাবা আছেন, তাঁরা আমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারবেন না।

—তবে এখন থাক। বলে, ভীষণ জোরে হেসে উঠলেন ঠাকুর। তারপর নরেনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। বললেন,—এখনও সময় হয়নি, তাড়াতাড়ি করে কাজ নেই।

কিন্তু এটা কি? নরেনের মনে দারুণ জিজ্ঞাসা, কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না।

একবার ভাবে, এটা নিশ্চয়ই হিপনোটিজম্ বা ম্যাসমেরিজম্। মুহূর্তে মনের দুর্বল চিন্তা বলে সব ঝেড়ে ফেললো মন থেকে।

নরেন ভেবেছিল আর আসবে না দক্ষিণেশ্বরে।

কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই আবার এসে হাজির হলো ঠাকুরের কাছে। এখানকার দুর্দমনীয় আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না সে।

এবার সে ঠাকুরকে পরীক্ষা না করে ছাড়বে না। আজ মনকে তৈরী করে এসেছে।

নরেনকে দেখে ঠাকুর তাকে নিয়ে যদু মল্লিকের বাগানের একটা ঘরে গিয়ে বসলেন। তারপর সামনাসামনি হয়ে নরেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মুহূর্তেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। নরেন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ঠাকুরের দিকে।

কিন্তু কোন এক সময়ে ঠাকুরের ধ্যান ভেঙ্গে গিয়েছে এবং তিনি নরেনকে স্পর্শ করেছেন, নরেন তা টেরও পায়নি।

এবার এক মুহূর্তেই নরেন জ্ঞান হারালো। এতটুকু চৈতন্য রইলো না আজ।

আর সেই ফাঁকে ঠাকুর তার কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন, —নরেন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ। এবার মানব কল্যাণের জন্যে জন্ম নিয়েছেন পৃথিবীতে।

ধীরে ধীরে নরেনের জ্ঞান ফিরে এলো। নরেন তাকিয়ে দেখলো ঠাকুর তেমনি সুন্দর হাসিমুখে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। নরেনের মনে হলো, সে যেন কোন এক দিব্যলোক থেকে ঘুরে এসেছে।

আজও বিরাট এক জিজ্ঞাসা মনে নিয়ে ফিরে এলো নরেন।

দিনরাত নরেন ভাবে, এটা কি ?

তাই বলে পড়াশুনায় ব্যাঘাত হয় না এতটুকু। সাফল্যের সঙ্গেই বি. এ. পাশ করলো নরেন।

কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্থলের সেই জিজ্ঞাসার সমাধান হয়নি এখনো। মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে নরেন।

কে এমন মহাপুরুষ আছে যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন, যিনি বলতে পারেন সৃষ্টির আদি রহস্য ?

তবে কি দক্ষিণেশ্বরের সেই অর্ধোন্মাদ মূর্খ ব্রাহ্মণের কাছেই রয়েছে তার সকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর ?

কিন্তু তিনিও যদি মহর্ষির মতো বলেন,—না, ঈশ্বরকে দেখিনি আমি, তাহলে ? সে যাই হোক, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ।

নরেন এলো ঠাকুরের কাছে। তারপর অন্য কথা না বলে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে ঠাকুরকে,—আপনি কখনো ঈশ্বরকে নিজের চোখে দেখেছেন ?

তেমনি সহজ সরলভাবে ঠাকুর হাসলেন। সে হাসিতে যেন অমৃত ঝরে পড়লো। যেন কোনকিছু চিন্তা না করেই উত্তর দিলেন,—নিশ্চয় দেখেছি গো! এই যেমন তোমাকে দেখছি, ঠিক তেমনি। তুমি দেখতে চাও, তোমাকেও দেখাতে পারি।

আশ্চর্যের সীমা থাকে না নরেনের। ঠাকুর কি বলছেন ? নিজে দেখার কোন গুরুত্বই নেই। অপরকেও যখন তখন দেখানোর এমন সৎ, গভীর আত্মবিশ্বাস তো এর আগে কখনো শুনিনি।

তবে তো এই ব্রাহ্মণ সামান্য নন।

এর পর থেকে এমন অবস্থা হলো যে, একজনকে না দেখলে আরেক জন থাকতে পারেন না বেশীদিন।

দিনকয়েক নরেনকে না দেখলেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন পরিচিত জনকে,—তোমরা নরেনের সংবাদ জানো ? সে আসছে না কেন ?

নরেনও কয়েকদিন অনুপস্থিত হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠতো দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য। ঠাকুরের কাছে এলেই সব ঠাণ্ডা। যেন কতদিন পরে দুজনে পেয়েছে দুজনের বাঞ্ছিত ধন।

একদিন সকলের সামনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কথা উঠলো। ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তক, অগাধ পণ্ডিত কেশবচন্দ্র। ঠাকুর অমনি বলে ফেললেন,—কেশব যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানলাভ করেছে সত্যি কিন্তু যে শক্তিতে সে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে তেমন আঠারটা শক্তি আছে একলা নরেনের মধ্যে।

কেশবের মধ্যে জ্বলছে জ্ঞানের প্রদীপ, আর নরেনের মধ্যে জ্বলছে জ্ঞানসূর্য।

ঠাকুরের কথা শুনে সকলে অবাক। কেউ প্রতিবাদ করবার সাহস পেল না।

কিন্তু যার প্রতিবাদ সেই আগে করলো। নরেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো,—এসব কি বলছেন আপনি? কোথায় বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধর্ম প্রবর্তক কেশবচন্দ্র আর কোথায় কলেজে পড়া একটা ছেলে নরেন্দ্রনাথ। লোকে শুনলে আপনাকে সত্যিই পাগল বলবে।

ঠাকুর তেমনি সাধারণভাবে বললেন,—তা আমি আর কি বলব। একি আর আমি বলছি। মা দেখিয়ে দিলেন তবেই তো জানতে পারলুম।

মা দেখিয়ে দিয়েছেন, না আপনি নিজের খেয়াল খুশী মত বলছেন, বললো নরেন। ঠাকুর বললেন,—তোর যা খুশী তাই বল। মা আমাকে বলেছেন, নরেন ছেলেমানুষ ওর কথায় কান দিসনা।

এবার নরেন একটু অবহেলার হাসি হেসে বললো, সবই আপনাকে মা বলে দিয়েছেন।

ঠাকুর কারো কোনো কথায় কান দেননা। কেবল নরেন আর নরেন। নরেনের নাম করতে করতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

অগত্যা নরেন একদিন বলে ফেললো, দেখুন মশাই, আপনার শেষকালে ভরত রাজার মত অবস্থা না হয়।

হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে ভরতরাজা প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে পরজন্মে হরিণ হয়ে জন্মেছিলেন।

বিবেকানন্দ—৩

ঠাকুর সে কথার জবাব দিলেন না। তিনিও ভাবতেন মাঝে মাঝে সত্যিই তো এতো লোক তো আসে তাঁর কাছে নরেনের জন্যেই বা মন এমন করে কেন।

তবে কি এটা মোহ?

না না না—ঠাকুরের মধ্যে জগন্মাতা বললেন, না মোহ নয়, নরেনের মধ্যে যে নারায়ণের সত্ত্বা আছে। তাকে অবহেলা করবার উপায় নেই।

তারপরেই ঠাকুর হেসে বললেন, ভেবেছ আমাকে ঠকাবে। সেদিনের ছেলে বই তো নয়।

নরেন বলে, আপনি মাঝে মাঝে এমন সব আজগুবি কথা বলেন যার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না, আর ওসব শুনতেও আমার ভালো লাগে না।

হাসতে হাসতে ঠাকুর জবাব দিলেন সে কথার,—ভালো লাগেনা তো আসিস্ কেন ছোড়া? আমার কাছে না এলেই তো পারিস।

নরেন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—আমার ভালো লাগে তাই আসি।

ঠাকুর জানতেন নরেন উচ্চমার্গের সাধক।

সাকার উপাসনায় তার আস্থা নেই। তাই ঠাকুর কোনো ব্যাপারেই নরেনকে জোর করতেন না। তিনি ভাবতেন নিরাকারে যদি ওর বিশ্বাস তবে তাই হোক না কেন। চিত্তের মধ্যে প্রেম যখন দানা বেঁধে উঠবে, তখন আর সাকার-নিরাকার ভিন্ন থাকবে? সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

ঠাকুর বলেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। যে যে পথে তাঁকে পেতে চায় সেই পথেই পাক না। পাওয়া নিয়েই তো কথা। চাওয়া পাওয়াই তো আসল কথা। কে কেমন করে চাইল আর কেমন করে পেল সে কথার বিচারে কাজ কি?

রাখাল মহারাজ ছিলেন ঠাকুরের অন্যতম ভক্তশিষ্য। সাকার সাধনায় দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর। একদিন নরেন বললো রাখালকে,—সাকার সাধনা আবার সাধনা নাকি?

ঠাকুর অমনি বলে উঠলেন,—তাতে তোর কি? ওর যদি সাকারেই বিশ্বাস থাকে তাতে তুই বাধা দিস কেন?

তারপর থেকে নরেন আর কখনো এ বিষয়ে কারো সঙ্গে তর্ক করেনি।

ঠাকুর বললেন, ব্রহ্মময় জগৎ। জগতের সব কিছু ব্রহ্মময়।

নরেন অমনি প্রতিবাদ করে—তাহলে এই সব ঘটিবাটি, এসবও ব্রহ্ম?

ঠাকুর হাসেন। উত্তর দেন না। ভাবেন কালে কালে তুই নিজেই বলবি এ কথা।

ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে সভা বসেছে। নরেন গেছে সভায়।

খবর পেয়ে ঠাকুরও এসেছেন। সভার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর। কারো ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে।

ব্যাপারটা নরেনের কাছে বিসদৃশ মনে হলো।

সভায় ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। তাই শুনতে শুনতে ঠাকুরের সমাধি হোল। তবুও কারো খেয়াল নেই সেদিকে।

নরেন আর চুপ করে থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি তুলে ধরলো ঠাকুরের এলিয়ে পড়া দেহখানি। তারপর বুকের সঙ্গে চেপে ধরে মন্দিরে নিয়ে এলো। তারপর ঠাকুরকে সুস্থ করে সুব্যবস্থা করে দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে দিল।

এই ঘটনার পর থেকে নরেন আর ব্রাহ্মসমাজে যায়নি।

তার উপর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী বললে,—ও সব স্নায়বিক দুর্বলতা। সমাধি-টমাধি বাজে কথা। দৈহিক কষ্ট করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গিয়েছে। জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন কিনা।

নরেন শুধু শুনে যায় আর মনে মনে বিচার করে।

তারপর অনেকদিন আর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হয়নি। কিন্তু নরেনের অদর্শনে ঠাকুর হাঁফিয়ে উঠলেন।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করছে নরেন তার নিজের আস্তানায়।

হঠাৎ কানে গেল যেন কোন পরপার থেকে কেউ তাকে আহ্বান করছে। চমকে উঠলো নরেন। তাড়াতাড়ি ছুটে এল নিচে।

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুর। অলৌকিক, অপরূপ স্নেহমণ্ডিত মুখ।

নিচু হয়ে প্রণাম করলো নরেন। মাথা তুলে দেখলো ঠাকুরের চোখে জল। নরেনেরও দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। নরেন ভাবে কোন সে দুর্বার আকর্ষণে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অতদূর থেকে এমনি করে ছুটে এসেছেন।

তাড়াতাড়ি ঠাকুরের হাত ধরে উপরে নিয়ে এলো। ঠাকুর মহানন্দে নরেনের সেই অপরিচ্ছন্ন ঘরে বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে গতিক খারাপ দেখে বন্ধুবান্ধবেরা সরে পড়েছে। ঠাকুর পরম স্নেহভরে নরেনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,—আমি ভাবলুম ভুলেই গেলি আমাকে, তাই আর ওদিকে যাবার নাম নিসনি।

তারপর গামছা থেকে সন্দেশ খুলে নরেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খা, তোরই জন্যে এনেছি।

নরেন পরম তৃপ্তিভরে সন্দেশ খায়। কিন্তু তার চেয়েও যেন বেশি তৃপ্তি পান ঠাকুর নরেনকে খাইয়ে।

অনেকদিন তোর গান শুনিনি, একটা গান কর। বললেন ঠাকুর।

নরেন যেন এই বলবার অপেক্ষায় ছিল। অমনি গান শুরু করে। জাগো মা কুলকুণ্ডলিনি···।

গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। একজন বন্ধু বললো,—উনি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

না। বললো নরেন,—এ অসুখ আবার গান শুনেই সেরে যাবে। হল'ও তাই। 'নরেন আবার গান ধরে—"একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ মা শ্যামা দিগম্বরী।"

ধীরে ধীরে ঠাকুরের জ্ঞান ফিরতে শুরু করলো।

যেন অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন। এমনি ভাবে জেগে উঠে

বললেন,—অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যাসনি। চল না আমার সঙ্গে। না হয় আবার গিয়েই চলে আসবি।

নরেন বলে,—বেশ তো চলুন না।

যেমন ঘর তেমনি পড়ে রইলো। নরেন বেরিয়ে পড়লো ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের পথে।

ধীরে ধীরে নরেনের জীবনের গতির মোড় ঘুরতে থাকে।

নরেন বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে। বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহে বরানগরে এক জায়গায় গান গাইতে গেল সেদিন।

গান শেষ হতে হতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। তখন বন্ধুরা আর এতরাত্রে নরেনকে বাড়ী ফিরতে দিল না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে বন্ধু-বান্ধবেরা সকলে মিলে গল্প করছে নানা বিষয়ে।

এমন সময়ে যেন বজ্রপাত হলো।

একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো—নরেনের বাবা হার্টফেল করে মারা গেছেন। এমন দুঃসংবাদ কেউই আশা করেনি।

সমব্যথী সাথীরা নরেনকে বাড়ীতে নিয়ে এলো।

বাড়ীতে সমগ্র পরিবার বিশ্বনাথবাবুর বিয়োগ ব্যথায় কাঁদছে। দারুণ শোকে নরেনও যেন ভেঙ্গে পড়ে।

তবুও যথাসময়ে যথারীতি শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ফিরে এলো নরেন।

এদিকে সংসারের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় ভাবে দেখা দিচ্ছে।

বিশ্বনাথবাবু তার জীবনে রোজগার করেছেন প্রচুর। কিন্তু উদারতার জন্য সঞ্চয় করে যেতে পারেননি কিছু। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল, জমা তো দূরের কথা—প্রচুর দেনা রয়েছে চারিদিকে।

ভুবনেশ্বরী দেবী চিন্তায় অধীর হয়ে পড়েন। কি করে এই ঋণ শোধ হবে। নরেন মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,—কিছু ভেবোনা মা। ঈশ্বর আমাদের সহায়তা করবেন।

মুখে সান্ত্বনা দিলেও বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে নরেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো।

সংসারের যা অবস্থা কোনো কোনো দিন অর্ধাহারেও কাটতে লাগলো। সারাদিন কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় নরেন। বাড়ীতে এসে মা আর ছোট দুই ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মর্মপীড়া আরো বেড়ে যায়।

বিশ্বনাথবাবু বেঁচে থাকতে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের ভিড়ে কান পাতা দায় হয়ে উঠতো এবাড়ী। আর আজ কাউকে ডেকেও পাওয়া যায় না। হঠাৎ যদি পথ চলতে কারো সঙ্গে সামনা-সামনি নেহাৎ দেখা হয়েই যায়, তাহলে নানা অজুহাতে এড়িয়ে যায় তারা। পাছে নরেন যদি ধার চায়।

ভুবনেশ্বরী দেবী নরেনের কথা ভেবে ভেবে অধীর হয়ে পড়েন। সারাদিন টো-টো করে কাজের চেষ্টায় ঘুরছে তো ঘুরছেই। প্রায়ই বাড়ীতে ফেরে সকলের খাওয়া দাওয়ার শেষে। বিকেলে, না হয় সন্ধ্যায়। এসেই একবার অবস্থাটি বুঝে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে।

মা বলেন,—এই তো ঘুরে ঘুরে এলি বাবা। যেখানে যেতে হয়, একমুঠো খেয়ে যা। কাল রাত থেকে যে কিছুই খাসনি।

মায়ের প্রাণের বেদনা অনুভব করে নরেন। তার জন্য হয়তো মা'ও না খেয়ে বসে আছেন। কিন্তু একজন খেলে হয়তো আরেকজনের খাওয়া হবে না। তাই নরেন, কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললো—তুমি খেয়ে নাও মা, জিতুদের বাড়ী আমার নেমন্তন্ন আছে। কি একটা কাজ আছে ওদের বাড়ীতে, কিছুতেই ছাড়ল না। আমি খেয়ে দেয়ে একেবারে বিকেলে আসব।

এমনি যেদিন বাড়ীতে আয়োজন কম থাকে সেদিন একজন মনগড়া নিমন্ত্রণ করার দোহাই দিয়ে বেরিয়ে আসে বাড়ী থেকে।

আজও বাড়ীর অবস্থা তেমনি ছিল বলে নরেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। কিন্তু ভুবনেশ্বরীর কাছে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়। তিনি যে মা।

তাঁর মনে শঙ্কা জাগে। একে ছোটবেলা থেকে ছেলে সংসার বিরাগী তার উপর এতবড়ো চাপ। শেষে বিরক্ত হয়ে যদি একটা কিছু করে বসে।

দিনের পর দিন অবস্থা আরো খারাপের দিকে যেতে থাকে।

শেষ অবধি একজোড়া চটির অভাবে খালি পায়ে ঘুরতে হয় নরেনকে। ঘুরতে ঘুরতে পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে যায়। তবুও চলতে হবে। ক্ষিধের জ্বালায় প চলে না, অগত্যা মনুমেণ্টের নিচেয় বসে একটু বিশ্রাম নেয়

এমন সময় দু তিন জন বন্ধু এসে জোটে। ধনীর দুলাল তারা। গরীবের দুঃখ বোঝে না। নরেনকে দেখে তার পাশে এসে বলল—কিরে নরেন এমন মনমরা হয়ে বসে আছিস কেন? একটা গান শোনা দেখি, মন ভালো হয়ে যাবে।

এবার আর নরেন নিজেকে সামলাতে পারে না। বেশ করে দু চার কথা শুনিয়ে দেয় তাদের। তারা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যায়।

এমনি দুঃখের দিনে একদিন প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারিনী এক তরুণী প্রস্তাব পাঠায় নরেনের কাছে। নরেন যদি তার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করে এবং প্রেমিকা বলে স্বীকার করে তাহলে তার প্রচুর ধন সম্পদ সে নরেনকে দিয়ে দিতে পারে।

প্রস্তাব শুনে নরেনের সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় জ্বলে ওঠে নরেন। সেই সংবাদ যে নিয়ে এসেছিল তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল,—ফের যদি কখনো এমন প্রস্তাব পাঠায় তাহলে সে আইনের আশ্রয় নেবে।

আবার একদিন কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ বন্ধু মিলে চেপে ধরে মদ খেতে। মদ খেলে দুঃখ দুর্দশা ভুলে যাবে। সেই সঙ্গে একটি সুন্দরী বেশ্যাকেও লেলিয়ে দেয় নরেনের পিছনে।

কিন্তু সেই নারী নরেনের তেজের কাছে পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে তারাই আবার প্রচার করে বেড়াচ্ছে—নরেন আজকাল মদ আর বেশ্যা নিয়ে মাতামাতি করছে।

দু'একজন ঠাট্টার সুরে বলে ফেলে,—কি হে নরেন, কি সব শুনছি যে?

নরেনও চীৎকার করে বলে ওঠে—বেশ করছি। আমার মনের দুঃখ লাঘব করবার জন্যে যদি আমি বেশ্যা নিয়ে আমোদ করে থাকি, মদ খেয়ে থাকি যদি দুঃখ ভুলে থাকার জন্য, তাতে কার কি এসে যায়? কে কার খবর রাখে এ জগতে? কে কাকে কল্যাণের পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে? কারো দুঃখের খবর নিতে আসে কি কেউ?

কথাটা রামকৃষ্ণের কানেও উঠলো দক্ষিণেশ্বরে। আজকাল বেশ্যা আর মদের মধ্যে ডুবে আছে। নরেন চরিত্রহীন, নাস্তিক।

ঠাকুর হেসে বললেন, ওরে নরেন যে খাপখোলা তরোয়াল সর্বশুদ্ধি, সাদা পবিত্র সূর্যের আলো যে ও। দুর্নীতির কলঙ্ক কখনই ওকে ছুঁতে পারবে না, আর নারী সঙ্গও হবে না ওর কোনদিন। ওর জন্যে তোদের মাথাব্যাথার কাজ নেই। তোরা নিজের চরকায় তেল দে।

নরেনের দুঃখের কথা শুনে ঠাকুর বললেন, আমি নিজে বেরুব নরেনের জন্য ভিক্ষা করতে। নইলে ওর কষ্ট আর আমার সহ্য হয় না।

কাছে যারা ছিল তারা অনেকে বলে কয়ে নিরস্ত করলেন ঠাকুরকে। এতে নরেনের বংশমর্যাদায় আঘাত লাগবে, তা সহ্য করতে পারবে না নরেন।

অগত্যা ঠাকুর মায়ের কাছেই জানান তাঁর প্রাণের কথা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মা!

এদিকে বাড়ী সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে গোলমাল লাগলো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে। তারা জানে নরেন সহায় সম্বলহীন। এই সুযোগে তাকে ফাঁকি দিতে সুবিধা হবে।

প্রথমে নরেন বিনীত ভাবেই বললো নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য

সৃষ্টি করা তার ইচ্ছে নয়। কিন্তু তার কথা কেউ শোনেনা। নরেনও তখন গর্জন করে ওঠে,—আমার বিপদের সুযোগ নিয়ে যদি কেউ আমায় জব্দ করতে চায়, আমি সে ঝক্কি মাথায় তুলে নিতে প্রস্তুত।

মামলা শুরু হলো। নরেনের পক্ষে তার বাবার বন্ধু বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব নিলেন।

কিন্তু আরও অর্থ চাই তার অন্য খরচ বাবদ। অগত্যা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বৌবাজার স্কুলে শিক্ষকতা সুরু করলো কিছুদিন। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হলো না।

এটর্নি নিমাই বসুর কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করে অর্থাভাবে বন্ধ করে দিতে হলো। ইতিমধ্যে কয়েকখানা ইংরাজী বই অনুবাদ করে কিছু অর্থাগম হয়েছিল বটে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য।

আইনের ছাত্র নরেনকে জেরা করে হারাতে পারে না বিপক্ষের ব্যবহারজীবি। হঠাৎ জেরার মুখে একদিন তিনি বলে ফেললেন, হি ইজ এ চেলা।

অমনি ফোঁস করে উঠলো নরেন। দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিল, ডু ইউ নো স্যার, হোয়াট চেলা ইজ ?

ব্যারিষ্টার এতখানি আশা করেননি। অবাক হয়ে যান তিনি। বিচারক নরেনের এমনি সাহসপূর্ণ ব্যবহারে খুশী হয়ে বললেন, কালে কালে এই তরুণ একজন ভালো আইন বিশারদ হবে।

এত কিছুর মধ্যেও পড়াশোনা ধ্যান-ধারণা, মামলার তদ্বির, দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা নিয়মিতই চলতে থাকে।

সারারাত চিন্তা করতে করতে কেটে যায়। সকালে উঠেই স্মরণ করে নারায়ণ, নারায়ণ—

কথাটা ভুবনেশ্বরী দেবীর কানে যেতে তিনি রেগে উঠলেন,—চুপকর হতভাগা। ও নাম আর মুখে আনিস না। ভগবান বলে

কিছু নেই। নইলে পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। এবার পৈতৃক বাস্তুটাও যাবার দাখিল।

আজন্ম অগাধ বিশ্বাসী ভুবনেশ্বরী দেবীরও মনের অবস্থা আজ এমনি পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। আঘাতে আঘাতে বিশ্বাসটুকুও নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাঁর!

মায়ের তিরস্কার শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় নরেন। ভাবে, তাহলে মা যা বলেছেন সত্যিই কি তাই?

ঈশ্বর বলে কোনো কিছু নেই?

সারাদিন সেই চিন্তা করতে করতে ঘুরতে থাকে নরেন। ঈশ্বর আছেন কি নেই? নেই যদি তাহলে এই জগত সংসার পরিচালিত হচ্ছে কার অদৃশ্য ইশারায়, আর যদি আছেন, তাহলে এত অবিচার কেন?

ভাবতে ভাবতে নরেনের ত্যাগধর্মী মন সংসার ত্যাগের জন্য বিচলিত হয়ে ওঠে। সংসারের এই সংকীর্ণ বেড়াজালের বাইরে তার মন ছুটে চলেছে অনন্ত অসীমের দিকে। সংসার ছেড়ে যাওয়াই স্থির হলো অবশেষে।

কিন্তু যাবার আগে একবার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া দরকার।

কলকাতায় কোন এক ভক্তের বাড়ীতে ঠাকুর এসেছেন। দেখা করবার অসুবিধা হবেনা বেশি।

সবশুনে স্নেহমাখা কণ্ঠে ঠাকুর বললেন সংসার ত্যাগ করবি সে তো ভালো কথা। তার আগে একবার দক্ষিণেশ্বরে চল। তোর সঙ্গে দুটো কথা কইবো।

না ঠাকুর, দক্ষিণেশ্বরেও যাবো না আর ঘরেও ফিরবো না। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।

চোখবুঁজে ঠাকুর প্রার্থনা করেন জগন্মাতার কাছে। মা, নরেনকে দিয়ে যে জগতের অনেক বড়ো বড়ো কাজ করতে হবে। পূর্ণ-চৈতন্য এসে গেলে যে ওকে আর পাবো না। ওর মনে একটু মায়া ঢুকিয়ে দে মা।

তারপর প্রকাশ্যে বললেন,—একবারটি চল, সেখানে থেকে তোর যা মনে হয় তাই করিস।

অগত্যা নরেন চললো ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে।

সেখানে ভক্তগণের মধ্যে বসে বার বার নরেনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন ঠাকুর—তোকে হারিয়ে কি নিয়ে থাকবো আমি?

ভক্তরা অবাক হয়ে দেখেন ঠাকুরের লীলা।

সময় মত সকল ভক্তজন চলে যান। নরেন একা বসে আছে। ঠাকুর আবার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন,—জানি তুমি মায়ের কাজে এসেছো, সংসারে থাকা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তবুও যতদিন আমি আছি, অন্ততঃ আমার জন্যেও থাকো।

নরেনের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এ কথার কোনো জবাব সরেনা। চুপ করে বসে রইলো সম্মোহিতের মতো।

ভুবনেশ্বরী দেবী অনেক ভেবে চিন্তে আবার বললেন কথাটা,—দেখ বাবা, তোর বাবার দেখা সেই পাত্রীর এখনো বিয়ে হয়নি। এখনো তারা তোর আশা করে। যদি রাজী হোস, তাইলে কথা বলি। প্রচুর টাকা দেবে ওরা। তাছাড়া অতবড়ো একজন আত্মীয় পাওয়াও তো আমাদের ভাগ্যের কথা।

অবাক হয়ে বললো নরেন—তুমি কি বলছো মা? বিয়ে করে পরের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে অভাব দূর করতে চাও। এর চেয়ে চিরকার দুঃখে কষ্টে থাকা কি গৌরবের নয়? আমাকে বলি দিয়ে তোমরা দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাতে চাও?

না না। ওকথা বলিস না বাবা। আমি যে তোর মা। বলেন ভুবনেশ্বরী দেবী।

আমারও তো সেইটাই বড় গর্ব।

আচ্ছা নরেন, তোদের ঠাকুর তো শুনেছি বাকসিদ্ধ পুরুষ। মা কালীর সঙ্গে নাকি কথাবার্তা কন। তাঁকে একবার বলে দেখনা যদি আমাদের সংসারের একটা সুব্যবস্থা কিছু হয়।

কথাটা খুব ভালো লাগলো নরেনের। কারণ ঠাকুরকে সে যত ভক্তিই করুক না কেন ঠাকুরের ঐ মা শব্দটি সে মানতো না। ওটাকে ঠাকুরের মস্তিষ্কের খেয়াল বলেই ধরে নিয়েছিল নরেন।

দিনের পর দিন সংকট বেড়েই চলে। দারিদ্র্যের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নরেন। সহ্যের সীমা যেন ছাড়িয়ে গিয়েছে। অভাবের এই তীব্র তাড়না সহ্য করতে না পেরে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ছুটে এলো নরেন। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, ছেঁড়া ময়লা কাপড়-চোপড়, ছুটতে ছুটতে কাঁটায় খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত পা-দুখানা।

হাঁফাতে হাঁফাতে ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে পড়ে বললো,—চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি কিন্তু ওতে কিছু হবার নয়। সংসারের অবস্থা আর সহ্য করতে পারছি না। আপনার মাকে বলে দেখুন যদি দুঃখ মোচন করেন—নইলে সব গেল।

নরেনের দুরাবস্থা দেখে ঠাকুরের চোখে জল আসে। সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,—আগে একটু সুস্থ হয়ে নে, তারপর কথা বলছি।

কিছুক্ষণ পর বললেন, তুই তো আবার মাকে মানিস না, যা না মানিস ত তার কাছে কি প্রার্থনা করা যায়? আমি আবার মায়ের কাছে কখনো কিছু চাইনি। আজ মঙ্গলবার আছে। তুই বরং মন্দিরে গিয়ে মার কাছে সব বল, তিনি নিশ্চয়ই তোর কথা শুনবেন।

নরেন ইতস্তত করতে থাকে। সত্যিই তো, সে তো বিশ্বাস করেনা, তবে কেমন করে অন্তর দিয়ে চাইবে।

ঠাকুর বললেন, যা না দেরী করছিস কেন? আজ দিনটা ভালো—মা তোকে নিরাশ করবেন না।

ঠাকুরের প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে পায়ে-পায়ে মন্দিরের দিকে রওনা হলো নরেন। মন্দিরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো মায়ের মূর্তির সামনে। মাথা তুলে চেয়ে দেখলো সামনে। কিন্তু একি? এতো অবিশ্বাস করবার মতো নয়। রাজ রাজ্যেশ্বরী মূর্তিতে মা সজ্জিতা।

শ্যামোজ্জ্বল রূপের চারিদিকে তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কে বলে এ প্রাণহীন পাষাণ মূর্তি ?

সহসা নরেনের কণ্ঠ ভক্তিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। আপনা-আপনি তার মাথা নত হয়ে পড়লো মায়ের শ্রীচরণে।

মা, মা, মা। মাগো আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।

প্রাণের কথা জানিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এলো নরেন। চোখে তার আনন্দের অশ্রু তখনো টল টল করছে।

ঠাকুর তাকে দেখে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—বলেছিস ? বলেছিস তোর প্রাণের কথা ?

চমকে উঠলো নরেন,—ঐ রে ! আমার আসল কথাতো কিছু বলা হয়নি।

ঠাকুর হেসে বললেন,—দূর বোকা ছেলে, যা যা এবার গিয়ে বল।

নরেন আবার এলো মন্দিরে মাতৃমূর্তির সামনে। আবার করজোড়ে বললো, মাগো ! আমাকে জ্ঞান দাও ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।

এবারেও ফিরে আসতে ঠাকুর তেমনি মুচকি-মুচকি হাসতে হাসতে বললেন—কিরে এবার কি হলো ? যেন ঠাকুর সব জেনে শুনেই জিজ্ঞাসা করলেন।

না ঠাকুর এবারেও চাইনি। বলল নরেন।

তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি যদি একেবারেই থাকে ! আর একবার—বুঝলি ? এই শেষবার অর্থাৎ বার বার তিন তিনবার। এবারে মন শক্ত করে গিয়ে বল তোর দুঃখের কথা।

নরেন আবার গেল মন্দিরে। আবার সে মায়ের মূর্তির সামনে গিয়ে মাথা নত করে বলল, মা আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।

এবার ফিরে এসে ঠাকুরের কাছে বসে বললো,—না ঠাকুর, পারলাম না চাইতে। বলতে পারলাম না আমার অভাবের কথা।

পারলি না ? তাহলে তোর কপালে সংসার সুখ নেই। বললেন ঠাকুর।

নরেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পরমযোগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মুখের পানে। অধীর হয়ে বললো নরেন,—ঠাকুর, আমি ধন সম্পদ চাই না। শুধু আমার মা ভাই বোনেরা যেন সাচ্ছন্দ্যে খেতে পরতে পায়, আপনি তাই করে দিন।

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে নরেনের দিকে তাকালেন বাকসিদ্ধ পরমহংস দেব। প্রকাশ্যে বললেন,—আচ্ছা যা, এখন থেকে তোদের সংসারে মোটা ভাত কাপড়ের অভাব আর কোনদিন হবে না।

কথাটা শুনেই নরেনের সমগ্র শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায়, ধীরে ধীরে তার মাথা নত হয়ে পড়ে ঠাকুরের চরণে।

ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করেন,—আজ আবার দক্ষিণেশ্বরে যাবি নাকি।

হ্যাঁ মা, কদিন আর ওদিকে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, বলল নরেন।

ভুবনেশ্বরী আর কিছু বললেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর ছেলে গুরুবরণে ভুল করেনি।

ঠাকুরের সেদিনকার আশীর্বাদের পর থেকে সত্যি সত্যিই নরেনের সংসারের অভাব ঘুচে গেল। সেই থেকে নরেনও একটা অস্বস্তিকর ভাব থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। এখন নিশ্চিন্তে একটু এখানে সেখানে যাওয়া যায়। ঠাকুরের সঙ্গেও খানিকক্ষণ বসে আলাপ আলোচনা করতে পারে।

ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠলেও প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগ বিনা কোনো কথা মেনে নিতে রাজী হয়না নরেনের দার্শনিক মন।

প্রতি কথায় প্রমাণ চাই। পরীক্ষা চাই। তবে বলবে হ্যাঁ।

ঠাকুর এতে বরং খুশীই হন। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়েই নরেনের সন্দেহ নিরসন করতে পারেন তিনি এবং নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতেও পারেন নরেনকে।

নরেনের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার দেখে কোন কোন ভক্তেরা সামনেই বলে ফেলে,—আপনি ওকে একটু বেশি ভালবাসেন, তাই দু-দিন না দেখলেই অধীর হয়ে ওঠেন।

ঠাকুর বললেন,—তা কেন, ওরই জন্যে তো আমার এই দেহে আসা। বলে, ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে দেন। ঠাকুর আরও বলেন,—ভক্ত না হলে ভগবানকে চিনবে কে? তাকে বিশ্বাস করবে কে?

নরেন পাশেই বসেছিলো। বললো,—ঐ আপনাদের এক কথা। বিশ্বাসটাই অন্ধ। দিনরাত ভগবান ভগবান করে একটা অন্ধ বিশ্বাস এসে গেছে আপনাদের মনে।

ঠাকুর অমনি দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করলেন, কি বললি? অন্ধ বিশ্বাস আবার কেমন কথা ওরে, বিশ্বাস মাত্রেই তো অন্ধ, হয় বিশ্বাস বল, নতুবা বল জ্ঞান। অন্ধবিশ্বাস আর চোখওয়ালা বিশ্বাস আবার হয় নাকি?

এবার নরেন আর জবাব দিতে পারে না। তার মাথা নত হয়ে আসে। সে বুঝতে পারে এ কথার উত্তর দেওয়া বই পাড়া বিছার কাজ নয়। শোনা কথাও খাটে না। এর জন্য চাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

এমনি করে ধীরে ধীরে নরেনের মনে বিশ্বাসের পাকা ভিত গাঁথা হতে থাকে। ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করতে থাকে ঠাকুরকে। ঠাকুরের মতবাদকে।

সেদিন হঠাৎ ঠাকুরের কাছে পঞ্চবটীতলায় বসে সাধনা করবার অনুমতি চেয়ে বসলো।

ঠাকুর প্রাণের আনন্দে খানিকটা হেসে বললেন,—আগে যে এসব মানতিস না।

নরেন বলে,—এখন আপনার কাছ থেকে সব জেনে শুনে নিলাম যে।

তাহলে পড়াশোনা ছেড়ে দিবি?

আর শিখে কি হবে ও সব? এমন ওষুধ যদি পাই, যা খেলে পুরনো শিক্ষা সব ভুলে যাই, তাহলে তো বেঁচে যাই।

ঠাকুর মনে মনে হেসে বললেন,—আচ্ছা তাই হবে।

ভক্তদের মধ্যে বসে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। বৈষ্ণব ধর্মের সারমর্ম সর্বজীবে দয়া। জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন আর নামে রুচি। এই হোল বৈষ্ণবের সারকথা।

বলতে বলতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হলো। ভক্তরা সব তাকিয়ে আছেন ঠাকুরের দিকে। হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন—দূর শালা, তুই তো কীটানুকীট। জীবে কি দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? তার চেয়ে বল, সেবা। জীবে সেবা কর। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

কথা শুনে নরেন চমকে ওঠে। দ্বৈতবাদী সাকার উপাসক ঠাকুরের মুখে অদ্বৈতবাদের এ কি কথা? শিবজ্ঞানে জীবের পূজা? সেবা? এ যে বেদান্তবাদের সঙ্গে ভক্তি আর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অন্তরের কোমল বৃত্তির অপূর্ব মিশ্রণ।

তবে কি ঠাকুর অদ্বৈতবাদী? অথবা দ্বৈত-অদ্বৈত্যের ঊর্ধে? না সব কিছুর মিলনে অপরূপ এক বাদী?

নরেনের মনে হলো এতদিন যাবত সে যা খুঁজছিল, তা যেন পেয়ে গেছে এক মুহূর্তে। যেন তার জীবনের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর রয়েছে এই নির্লিপ্ত ঠাকুরের কাছে। আত্মার মধ্যে আছেন পরমাত্মা, তাই শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। কি চমৎকার চিন্তা। সাকারবাদীর মূর্তিপূজা আর নিরাকার বাদীর ব্রহ্ম উপাসনা। একটি যেন অন্যটির সোপান। দুটোরই ত উদ্দেশ্য এক। যেমন করে হোক তাঁকে পাওয়া নিয়েই তো কথা।

ঠাকুর নরেনকে যেমন স্নেহটুকু দিয়ে ভালবাসতেন তেমনি তার দোষ ত্রুটিরও সময়ও শাসন করতেন।

নরেন তখনো পুরোপুরি ভক্ত বলে পরিচিতি পাননি।

না গৃহী, না সন্ন্যাসী। দুয়ের মধ্যবর্তী ভাব।

এমনি সময়ে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গলার মধ্যে বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য কর্কটরোগ। ভক্তরা ঠাকুরের চিকিৎসা করবার জন্য তাঁকে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে নিয়ে এলেন।

এতদিন ঠাকুর কখনো নরেনকে সেবা করতে দিতেন না। এবার কিন্তু সেবার ভার নিয়ে নিজেই এগিয়ে এলো। প্রায় সময় বসে থাকতো ঠাকুরের পাশে। ঠাকুরও বাধা দেননি। তিনি ভাবতেন এই সময়ে ওকে ভালো করে গড়ে তুলতে হবে।

সেদিন ঠাকুর একটা কাগজে লিখলেন,—নরেন জগৎকে লোক শিক্ষা দেবে। নরেন অমনি চীৎকার করে বলে উঠলো,—না না, আমি পারবো না।

দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন ঠাকুর,—তোকে পারতেই হবে। তুই পারবি না তো তোর ঘাড় পারবে। জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন।

নরেন আর উত্তর করে না।

নরেন এখন প্রায়ই পঞ্চবটীর বনে বসে ধ্যান করে। ধুনি জ্বালিয়ে সারারাত ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে। কখনো কখনো দেখতো ধুনির পাশে নানা দেবদেবীর সমাগম হয়েছে, তখনই মনে হতো ঠাকুরের কথা।

রাত পোহালে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলে,—ঠাকুর, আমাকে নির্বিকল্প সমাধি দাও।

প্রথম প্রথম ঠাকুর যেন শুনেই শুনতে পাননি এমনি ভাব দেখাতেন, কিন্তু নরেনের পীড়াপীড়িতে থাকতে না পেরে বললেন,—আচ্ছা আচ্ছা, তাই দেব তোকে। আগে আমি সেরে উঠি, তারপর দেখিয়ে দেব সকল পথ।

নরেন বলে,—আপনি যদি আর ভালো না হ'ন?

শালা বলে কি? যেন আত্মগত হয়েই বললেন ঠাকুর। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—আচ্ছা, তুই কি চাস বল?

আমি যেন শুকদেবের মত একাদিক্রমে পাঁচ ছয়দিন সমাধিতে

ডুবে থাকতে পারি। শুধু দেহধারণের জন্যে মাঝে মাঝে একটু জাগবো আবার মগ্ন হয়ে যাবো ধ্যানে।

ছি, ছি, ছি! অমনি তিরস্কার করে ওঠেন ঠাকুর। তোর মুখে এত ছোট কথা? কোথায় একটা বটগাছের মত বড় হবি। তোর শীতল ছায়ায় কত পাপী-তাপী এসে আশ্রয় পাবে, তা নয়, কেবল নিজের মুক্তির কথা! এতো তুচ্ছ স্বার্থবাদী তুই! না না, অত ছোট হসনি। নজর উঁচু কর। মাছ খাবি তো মাছ ভাজাও খাবি। আবার ঝাল, ঝোল, অম্বল সব খাবি। আমি তেমনি ভালবাসি। তাঁকে সমাধির মধ্যে নির্গুণভাবে যেমন উপলব্ধি করবো, তেমনি মুক্তির মধ্যে দিয়ে ঐহিক সম্বন্ধেবোধেও ভোগ করবো। তুই দুটোই হ'। একই সঙ্গে জ্ঞানী আর ভক্ত।

নরেন বুঝতে পারে ঠাকুর তার সমাধির বিরোধী নন। কিন্তু সে শুধু সমাধি নিয়েই পড়ে থাকুক, তাও চান না ঠাকুর। নরেন তাই কেঁদে ফেলে ঝর-ঝর করে। ঠাকুরের মৃদু তিরস্কারের মধ্যে নরেন দেখতে পায় তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথনির্দেশ। শুধু নিজের মুক্তির জন্য এগিয়ে গেলে চলবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি জীবকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে তাদেরও আলো দান করতে হবে।

ধীরে ধীরে ঠাকুরের মতেই মত হলো নরেনের।

মূর্তিপূজার বিরোধী নরেন্দ্রনাথ কখনো বা পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শন নিয়ে তর্ক করে আবার কখনো খোল-করতাল নিয়ে সংকীর্তনে মেতে ওঠে। আবার কখনো অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে মাধুকরী এনে স্বহস্তে রান্না করে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে।

সব বিষয়েই নরেন সকলের আগে।

ঠাকুর সব দেখেশুনে একদিন ছেলেদের ডেকে গেরুয়া দান করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিয়ে বললেন,—এখন থেকে যেখানে সেখানে খেলে তোদের আর দোষ নেই।

ঠাকুরের অসুখ বেড়েই চলেছে। রোজই অসংখ্য দর্শনার্থী এসে ভীড় করে। তাদের মধ্যে নানা জনে বলে যায় নানা কথা। যার যেমন রুচি, যেমন ভক্তি। ঠাকুরের তাতে বিরক্তি নেই, অসন্তোষ নেই।

মাঝে-মাঝে নরেনকে ডেকে বলেন,—শোন, এরা বলে আমি নাকি ঈশ্বর। আমি নাকি ভগবানের অবতার।

নরেন বললো,—যে যা খুশী বলুক, আমি ওসবে নেই। হাজার লোকে যদি আপনাকে ঈশ্বর বলে আমি যতক্ষণ না প্রমাণ পাচ্ছি ততক্ষণ মানছি না। আমি যা চাই তা হলো শান্তি, সত্য, জ্ঞান। আর সেগুলি যখন আপনার মধ্যে আছে, তখন ঈশ্বর দিয়ে কি হবে আবার ?

সেদিন বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য পাঠ করে তথাগতের জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠলো নরেনের। তারপর কালি আর তারককে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে গেল বোধগয়াতে।

এদিকে ওদের না পেয়ে সকলে বিশেষ চিন্তিত হয়ে ঠাকুরের কাছে ছুটোছুটি করতে লাগলো। ঠাকুর কিন্তু নির্বিকারভাবে বললেন, —তোদের কাউকে ভাবতে হবে না। ওদের নাড়ী বাঁধা আছে এখানে, এই এসে পড়লো বলে।

তিনদিন পর সত্যিই ফিরে এলো তিনজনে।

কালি বললো,—বোধিবৃক্ষের নিচেয় বসে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে নরেন। তারপর অনেক কষ্টে তার জ্ঞান ফিরেছে। ধ্যানের মধ্যেই সে ভগবান তথাগতের দর্শন লাভ করেছে।

পাশাপাশি ঘরে বসে ধ্যান করছে নরেন আর গোপালদা। হঠাৎ নরেনের চীৎকারে ছুটে এসে বললো,—কি হয়েছে ?

কাতরকণ্ঠে নরেন বললো,—আমার শরীর কই গোপালদা ? আমার হাত-পা ? শুধু মাথা ছাড়া আর কিছুই যে নেই।

গোপালদা আশ্চর্য হয়ে নরেনের দেহের জায়গায় জায়গায় হাত দিয়ে দেখতে লাগলো,—এই তো তোমার হাত-পা প্রভৃতি। কিন্তু নরেনের তবুও অনুভব নেই। কথাটা ঠাকুরের কানে যেতে তিনি বললেন,—বেশ হয়েছে। এইভাবে থাক কিছুদিন। ঐটার জন্যে আমাকে বড্ড জ্বালাতন করছিল।

নরেনের নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে।

সমাধির মধ্যে দেখতে পেল যেন বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড জ্যোতির সমুদ্রে জ্যোতির্ময় ফেনরাশি তরঙ্গের পর তরঙ্গে নৃত্য করতে করতে ভেসে চলেছে। সেই জ্যোতির অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান রয়েছে অনন্ত জ্যোতি ব্রহ্মসত্ত্বা। তার মধ্যে যেন কোনো এক অসীম ঊর্ধ-লোক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আযে ধামানি দিব্যানি তস্থু।"

জ্ঞান হবার পর ঠাকুর হেসে বললেন,—কেমন, এবার তো মা সব দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এখন ওসব রইলো তোলা। চাবি রইলো আমার কাছে। এখন শুধু কাজ করে যাও, তারপর আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে চাবি খুলে দেব। কিন্তু সাবধান, শরীরের উপর অযত্ন করবে না, আর খাওয়া-দাওয়াতে একটু বাছবিচার করো।

নরেন মাথা পেতে গ্রহণ করে ঠাকুরের উপদেশ।

ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন তাঁর আর বেশী দেরি নেই লীলাসংবরণ করবার। রোগটা ক্রমাগত খারাপের দিকে চলেছে। এখন আর কিছু খেতে পারেন না। একটু দুধও খেতে যেন কষ্ট হয়। নরেন অবশেষে বাধ্য হয়েই বললো,—আপনার মায়ের কাছে ত' আপনি কিছু চাইবেন না জানি, কিন্তু এত কষ্টও তো আর সহ্য করতে পারছি না। অন্ততঃ সামান্য কিছু গিলতে পারেন এ কথাটাও কি মাকে বলতে পারেন না? না হয় আমাদের নাম করে বলুন যে, ছেলেরা বলছে।

বলতে বলতে নরেন কেঁদে ফেলল। তার চোখে জল দেখে ঠাকুর বললেন,—তুই যখন বলছিস্ তখন নিশ্চয়ই বলবো।

নরেনের আর সহ্য হয় না। কতক্ষণে ঠাকুরের কাছে জবাব পাবে। বার-বার জিজ্ঞাসা করে,—বলেছেন? মা কি বললেন?

ঠাকুর বললেন,—বললুম তো, তাতে মা তোদের দেখিয়ে বলেন, অতগুলো মুখে খাচ্ছিস তাতে কি তোর পেট ভরছে না? তাই শুনে লজ্জায় আমি চুপ করে গেলাম।

ডাক্তার বলেছেন, অন্য সকলকে খুব সাবধানে থাকতে। রোগটা ছোঁয়াচে। কিন্তু কার কথা কে শোনে? সাবধানে থাকা মানে তো বিচ্ছেদ হওয়া। তা কি করে সম্ভব? হঠাৎ কি ভেবে ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সুজির পায়েসগুলি খেয়ে ফেলল নরেন; যার মধ্যে পুঁজ-রক্ত মিশেছিল। খেয়ে নিয়ে বলল সকলকে,—আজ আমি অমৃত পান করলাম। তোরা কেউ চিন্তা করিস না।

রাত্রে নরেনের অস্বস্তি বেড়ে চললো ক্রমাগত। ঠাকুরের আরোগ্য লাভের জন্য দৈবীকৃপা লাভ করতে বাগানের মধ্যে গিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো, আর মুখে বলতে লাগলো,—রাম, রাম, রাম। একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটে বেড়ায় নরেন। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। যে দেখে সেই অবাক হয়ে যায়।

প্রায় শেষ রাত্রে ঠাকুরের কানে গেল। অমনি ডেকে পাঠালেন নরেনকে।

কয়েকজন ভক্ত মিলে জোর করে নরেনকে ধরে নিয়ে এলো ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর বললেন,—ওটা আবার কি করছিলি? আমি টানা বারোটা বছর অমনি করেছি, আর তুই এক রাত্তিরে পারবি?

ঠাকুর বললেন,—আমি তো চলে যাচ্ছি, সাধনা করতে করতে অষ্টসিদ্ধি পেয়েছিলাম, তুই নিবি সেটা?

চলে যাবার কথা শুনে নরেনের মন খারাপ হয়ে যায়। তবুও একটু সামলে নিয়ে বলল,—ওতে কি ঈশ্বরলাভ হবে?

ঠাকুর বললেন,—না, ঈশ্বরলাভ হবে না, তবে অনেক অলৌকিক কাজ করতে পারবি এ দিয়ে।

—তবে ও চাই না আমার। বলল নরেন।

ঠাকুর খুব খুশী হলেন। ঠাকুরের পরীক্ষায় পাশ করেছে নরেন।

—তবে আমার কাছে এইখানটায় বোস দেখি। বললেন ঠাকুর।

নরেন সেইখানে গিয়ে বসলো। ঠাকুর একদৃষ্টে নরেনের দিকে তাকিয়ে থেকে সমাধিতে ডুবে গেলেন, অমনি নরেনের সমস্ত দেহে যেন একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। মনে হলো, ঠাকুরের দেহ থেকে যেন একটা বিজলীর রেখার মতো রশ্মি নরেনের দেহের মধ্যে এসে মিশে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নরেনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

যখন চেতনা ফিরে পেল, তখন দেখে ঠাকুর কাঁদছেন। নরেন আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা করে,—আপনি কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?

তেমনি ভাবেই উত্তর দিলেন ঠাকুর,—আমার যা কিছু ছিল, আজ সব তোকে দিয়ে আমি ফকির হলাম। তুই এই শক্তি নিয়ে বিশ্ব-কল্যাণ সাধন করিস। তারপর তোর কাজ শেষ হলে ফিরে যাস যেখান থেকে এসেছিস সেখানে।

রাত্রে নরেনকে ডেকে বললেন,—শোন, আমার সময় হয়েছে। রাখাল, বাবুরাম, কালি, শরৎ, শশী, তারক, লাটু ওরা রইলো। ওদের ভার তোর উপর দিয়ে গেলাম। ওদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান তুই। ওরা যেন ঘরে ফিরে না যায়, ওদের ভালবেসে এক জায়গায় রেখে সাধনার পথ দেখিয়ে দিস।

দারুণ বেদনায় নরেনের মন কেঁদে উঠলো। মর্মবেদনায় গুমরে গুমরে উঠতে থাকলো তার মন।

এমনি করে পুরো দুটো দিন ভীষণ মনোবেদনায় ছটফট করতে থাকলো নরেন।

অবশেষে সেই দিন এলো।

রবিবার। পনেরই আগষ্ট, আঠারশ' ছিয়াশি খ্রীষ্টাব্দ।

ঠাকুরের পাশে ভক্তরা সকলে বসে আছে। বিশ্বের বেদনাবিজড়িত এক মহাজীবনের মহাসমাধির ক্ষণ সমাগত। স্তব্ধভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নরেন।

নরেন মনে মনে ভাবছে ঠাকুরের শেষ সময় উপস্থিত। এইবার ওঁর নিজের মুখেই শুনে নেওয়া যাক উনি কে। সাধারণ সাধক না সত্যিই ঈশ্বরের অবতার। এই প্রশ্নটির সমাধান হলেই নরেনের জীবনের একমাত্র মহাজিজ্ঞাসার সমাধান হয়ে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঠাকুর চোখ মেলে চাইলেন। নরেন তাকায় ঠাকুরের দিকে। অভিমানভরা কণ্ঠে বললেন ঠাকুর,—নরেন, এখনো তোর সন্দেহ গেল না? ওরে, যে রাম, যে কৃষ্ণ, এবার সে-ই একদেহে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।

চমকে উঠলো নরেন সেই কথা শুনে। একমাত্র অন্তর্যামী নারায়ণ ছাড়া তার মনের কথা কেমন করে জানবে? এর পর আর সন্দেহ করবার কি আছে? আজীবন যে কামনা করেছিল, তার উত্তর পেয়ে যেন-এক দৈবানুভূতিতে ভরে উঠলো তার সমগ্র দেহ মন।

ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ধীরে ধীরে ঠাকুরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। বার বার তিনবার উচ্চারণ করলেন কালীনাম।

তারপর ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল।

পরম যোগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের পরমাত্মা বিদায় নিলে পৃথিবীর সীমার বাইরে অনন্তলোকের পথে।

ছোট শিশুর মত "ঠাকুর" বলে নরেন কেঁদে লুটিয়ে পড়লো ঠাকুরের পায়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে অগণিত ভক্ত শিষ্যের চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর সন্ন্যাসীদের অনেকে চেষ্টা করেছিল ঘরে ফিরে যেতে। কিন্তু নরেনের চেষ্টায় তা আর সম্ভব হয়নি।

কাশীপুর বাগানের ভাড়া দিচ্ছিলেন যারা তারা আর ভাড়া টানা রাজী হলেন না। অগত্যা সুরেনবাবুর চেষ্টায় বরানগরে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে মঠ প্রতিষ্ঠা হলো ডিসেম্বর মাসে।

ঠাকুরের দেহাবশেষ এনে এখানে স্থাপনা করে পূজা-অর্চনারও ব্যবস্থা হলো। সকল সন্ন্যাসীদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ এক সঙ্ঘ স্থাপন করলো। ঠাকুর ভার দিয়ে গেছেন নরেনের উপর, তাই নরেনকেই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

গুরুভাইরা নরেনকে পেয়ে মহাখুশী। তাদের মধ্যে অনেকে নরেনকে ঠাকুরের প্রতিনিধি ভাবে। তাই নরেনই তাদের নেতা, নরেনই তাদের পথপ্রদর্শক।

ইতিমধ্যে কিছু কিছু তরুণ সন্ন্যাসী ঘরে ফিরে গিয়েছিল। নরেন আবার বহু চেষ্টা করে তাদের মঠে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ফলে সেই সব তরুণদেব অভিভাবকেরা নরেনের উপর ভীষণ রেগে গেলেন, কিন্তু নরেনের যুক্তির কাছে কেউ টিকতে পারে না।

মঠ আর সাধন-ভজন নিয়ম মতো এগিয়ে চলে।

নরেন ছাড়া আর একজনের প্রখর দৃষ্টি ছিল মঠের উপর। তিনি হলেন সুরেন মিত্তির। মঠের সন্ন্যাসীদের দেখাশোনার জন্যে তিনি লোক নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং খাবার-দাবার থেকে শুরু করে যাবতীয় দরকারী জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করতেন নিয়ম মাফিক। কিন্তু কখনও কাউকে জানতে দেননি তাঁর এই মহৎ দানের কথা। এমন কি সন্ন্যাসীরাও জানতো না।

নরেন চায়—ঠাকুরের মাহাত্ম্য আর ঈশ্বরের কথা, জগতের কল্যাণের কথা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করতে হবে। গুরুভাইয়া বলে,—না, নির্জনে বসে ধ্যান-সাধনার দ্বারা ঈশ্বরলাভই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরে না হয় একজায়গায় বসে ঠাকুরের মত পরোক্ষভাবে জনকল্যাণ করা যাবে।

নরেন হেসে বলে,—তোরা দেখছি সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হতে চাস। তা কি হয় রে? রামকৃষ্ণ একজনই জন্মেছেন। বিশ্বের

কল্যাণের জন্য তিনি একবারই অবতীর্ণ হন। তোরা তো পিঁপড়ে, একটা চিনির দানা পেলেই তোদের পেট ভরে যাবে, অথচ তোরা গোটা চিনির পাহাড়টাকেই চাইছিস। তার চেয়ে যা বলছি তাই কর। তাতে ঠাকুর সন্তুষ্ট হবেন। সাধনা যদি করবি, তাহলে শরীর ঠিক রাখ।

তখন সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো। কিন্তু সকলেরই ইচ্ছে তীর্থভ্রমণের। নানা জায়গা ঘুরে দেখবার জন্য। অথচ বলতে সাহস করে না কেউ।

হঠাৎ সেদিন সারদাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল মঠে। খুঁজতে-খুঁজতে একটা চিঠি পাওয়া গেল সারদার হাতে লেখা। লিখেছে,—এখানে থাকলে বাড়ীর লোকেরা আমাকে বিরক্ত করবে, আমার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে, তাই হাঁটাপথে বৃন্দাবন যাচ্ছি।

বালক সারদার জন্য নরেনের চিন্তা হয়। আবার ভাবে, দারুণ বৈরাগ্য-ভাব না এলে এত বড়ো ঝক্কি মাথায় নিতে পারতো না সারদা।

রাজা অমনি বলে উঠলো,—আমারও ইচ্ছে করছে একবার তীর্থে তীর্থে ঘুরে আসি।

নরেন তাকে ভর্ৎসনা করে বললো,—তা যাবে বৈকি! এমনি করে তোমরা যদি সব ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াও তাহ'লেই চতুর্ভুজ হয়ে ঈশ্বর তোমাদের দেখা দেবেন। আর আমি এত কষ্ট করে মঠ প্রতিষ্ঠা করলাম সেটা চুলোয় যাক।

মুখে সকলকে বারণ করলেও নরেনের নিজের মনে যে সেই ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে তা সে বলতে পারতো না কাউকে।

কিন্তু বেশীদিন সে-ভাব চেপে রাখতে পারলো না। অবশেষে পথের ডাকে একদিন তাকে বেরিয়ে পড়তেই হলো।

আর, সেই দিনই নরেন্দ্রনাথের পরিচয় লুপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানসসন্তান বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ।

অন্যান্য গুরুভাইরা এতদিন নরেনের ভয়ে কিছু সাহস করেনি। কিন্তু এবার রাস্তা খোলা পেয়ে একে একে তারাও পরিব্রাজকের বেশে বেরিয়ে পড়লেন। তাদেরও পূর্ব পরিচয় লুপ্ত হয়ে নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেল।

স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে তরুণ সন্ন্যাসীর দল ভারতভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু মঠ বুকে করে পড়ে রইলেন শশী মহারাজ। মঠই তাঁর স্বর্গ। ঠাকুরের সেবা আর পূজা-অর্চনা নিয়ে পড়ে রইলেন তিনি।

বিবেকানন্দ চলেছেন ভারতের তীর্থে তীর্থে।

একবার সেদিকে তাকালে আর কেউ চোখ ফেরাতে পারে না। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ শরীর, আয়তনেত্রে উন্নত দৃষ্টি, ললাটে প্রতিভার জ্যোতি, গেরুয়াবসন, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু আর একটি গীতা।

স্বামীজী চলেছেন বৃন্দাবনের পথে। যাবার সময় মোগল স্থাপত্য-শিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন তাজমহল দেখলেন।

আবার চলতে লাগলেন। কপর্দকশূন্য অবস্থা। খিদেয় দেহ অবসন্ন হয়ে আসে। অতঃপর একটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর নাকে তামাকের গন্ধ যেতে পিছন ফিরে দেখলেন একটি লোক তামাক খাচ্ছে। তাই দেখে বহুদিন পর তামাক খাবার ইচ্ছে হলো স্বামীজীর। তখন লোকটির কাছে গিয়ে হাত পাতলেন তিনি।

লোকটি স্বামীজীর সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সসম্ভ্রমে বললো,— মহারাজ, হাম ভঙ্গী হ্যায়। অর্থাৎ লোকটি মেথর। স্বামীজীর আর তামাক খাওয়া হলো না। তিনি এগিয়ে গেলেন। কিন্তু খানিকদূর গিয়েই আবার ফিরে এলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো—একি! তাঁর তো এমন করা উচিত হয়নি। শিব আর জীব যে সমান তার কাছে।

এসেই লোকটির কাছ থেকে চেয়ে তামাক খেলেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছে রাধারমণের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুরতে লাগলেন। খিদেয় তেষ্টায় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। অথচ কোনো

ব্যবস্থাই নেই। মনে মনে ভাবেন, ভিক্ষা চাইবেন না, ঈশ্বর যা জোটান তাই খাবেন, নতুবা উপোস দেবেন।

এমন সময়ে পিছন থেকে কে যেন ডাকলো। স্বামীজী সে-ডাকে ভ্রুক্ষেপ না করে চললেন আপনার পথে। খানিকদূর এগিয়ে যেতে দেখলেন একটি লোক ছুটতে-ছুটতে তাঁরই কাছে এসে কিছু খাবার হাতে দিয়ে বললো,—মহারাজ, আপ ভুখামে হ্যায়—মেহেরবানী করকে ইয়ে খানা খাইয়ে!

স্বামীজীর চোখের কোণে অশ্রুর ফোঁটা দেখা দেয়। মনে মনে বললেন,—রাধারমণ, তুমি আছো। কথায় বলে, "জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি"—এ কথায় যে অবিশ্বাস করে, সে মূর্খ। তবে তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে।

একখানি মাত্র কৌপীন। আর কিছু নেই সঙ্গে।

রাধাকুণ্ডে এসে দেখলেন কেউ নেই কোথাও। তখন নগ্ন হয়ে কৌপীনখানি কেচে দিয়ে জলের মধ্যে স্নান করতে লাগলেন। উপরে কৌপীনটা তখন শুকোচ্ছে। স্নান করে ফিরে এসে দেখেন কৌপীনটা নেই। তখন গাছের দিকে চেয়ে দেখেন, একটা বানর সেটাকে নিয়ে দিব্যি বসে বসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচেয় ফেলছে।

অভিমানভরে বিবেকানন্দ চাইলেন রাধাকুণ্ডের দিকে। মনে মনে বললেন,—রাধারাণী, আমার একমাত্র কৌপীনখানিও কেড়ে নিলে? বেশ, এই আমি বনে চললাম, আর লোকালয়ে যাবো না কখনো।

তেমনি নগ্ন হয়েই স্বামীজী খুব তাড়াতাড়ি বনের মধ্যে চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর দেখলেন একজন লোক নতুন গেরুয়া রঙে ছোপানো একটা কাপড় আর এক ঠোঙা খাবার নিয়ে আসছে। লোকটি স্বামীজীর কাছে এসেই সেটা তাঁর হাতে দিয়ে বললো,—আপনি দয়া করে এটা গ্রহণ করুন। বলেই লোকটা আবার তাড়াতাড়ি চলে গেল।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো স্বামিজীর সমস্ত অন্তর। কে বলে তুমি নেই ভগবান? তুমিই সত্য।

স্বামীজীর অনেকদিনের ইচ্ছা গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। তাই একবার ফিরবার পথে গাজীপুর এলেন। কিন্তু মৌনী ধ্যানী এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া অত সহজ নয়। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নির্জন গুহার মধ্যে বাস করেন তিনি। সেইখানেই তাঁর সাধন-ভজন সব কিছু। পাঁচিলের আড়ালে থেকে দর্শনার্থীর কথার জবাব দেন। স্বামীজীও সাক্ষাৎ করলেন। আলাপ-আলোচনাও করলেন পাঁচিলের ব্যবধানে থেকে।

হঠাৎ স্বামীজীর ইচ্ছা হলো পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবেন যোগশিক্ষার জন্য। পওহারী বাবাকে সে-কথা জানাতে তিনিও রাজী হলেন। কিন্তু দীক্ষা নিতে যাবার দিন একের পর এক বাধা আসতে লাগলো স্বামীজীর। তবুও মনকে দৃঢ় করে এগিয়ে গেলেন পওহারী বাবার কাছে।

সেখানে রাত্রে গভীর ,ঘুমে স্বপ্ন দেখলেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে, অভিমানভরা কণ্ঠে তিনি বললেন,—ওরে, আমি যে তোর প্রতি ধর্মে, কর্মে, মর্মে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, আমাকে কোথায় ঠেলবি তুই ?

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে স্বামীজী কাতরভাবে বলে উঠলেন,—জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! আমাকে ক্ষমা করো ঠাকুর, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করে ভুল করেছি!

সেখান থেকে ফিরবার দিন পওহারী বাবার ঘরে যাবার অনুমতি পেয়ে স্বামীজী গিয়ে দেখেন সেই ঘরে ঠাকুরের একটা ছবি। সেটা দেখিয়ে পওহারী বাবা বললেন, ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার।

অপরাধীর দৃষ্টিতে স্বামীজীর সেই ছবিটার দিকে চেয়ে মনে মনে প্রণাম করলেন।

এদিকে হৃষীকেশ থেকে, সংবাদ এলো সেখানে স্বামী অভেদানন্দ ভীষণ অসুস্থ। স্বামীজী অমনি ছুটলেন হৃষীকেশ। সেখানে গিয়ে স্বামী প্রেমানন্দের উপর অভেদানন্দের সেবা-শুশ্রূষা ও দেখাশোনার ভার দিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে সংবাদ এলো ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় গৃহীশিষ্য বলরামবাবু দেহত্যাগ করেছেন। অগত্যা স্বামীজীকে চলে আসতে হলো কলকাতায়।

১৮৯০ সাল। তিব্বত পরিভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। তাঁর কাছে তিব্বতের নানা কাহিনী শুনে স্বামীজীর খুব ইচ্ছা হলো হিমালয় ভ্রমণে যাবেন।

জুলাই মাসে অখণ্ডানন্দকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার সময় ঘুসুড়ীতে শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে চললেন দুজন।

প্রথমে বারাণসী, অযোধ্যা হয়ে নৈনিতাল। সেখান থেকে কেদার-বদরীর পথে যাত্রা করলেন। দুর্গম পথে দুঃসাহসিক যাত্রা। একেবারে কপর্দকহীন দুজন সন্ন্যাসী দিনের পর দিন তুষারমণ্ডিত পার্বত্য পথে এগিয়ে চলেছেন। পথের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না। কোথাও আকাশচুম্বী গিরিরাজ হিমবাহনের মহা-মহিমান্বিত ধ্যানগম্ভীর ভাবসৌন্দর্য, কোথাও কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলেছে ছোট ছোট পাহাড়ী নদী, কোথাও চিরসবুজ দেওদার গাছের অপূর্ব শোভামণ্ডিত জঙ্গল। চারিদিকে নির্ঝরসেবিত হিমেল হাওয়া। তারই মধ্যে নিরলস দুই ভারতপথিক চলেছেন ভারত দর্শনে।

আলমোড়ায় এসে সাক্ষাৎ হলো স্বামী কৃপানন্দ আর সারদানন্দের সঙ্গে। তাঁরাও ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন ভারতময়।

আলমোড়া থেকে শ্রীনগর, সেখান থেকে টিহিরী, টিহিরী থেকে মুসুরী হয়ে রাজপুর। সেখান থেকে হৃষীকেশ। এখানে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্বামীজী। ক্রমশঃ অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। আশপাশে ক্রোশের পর ক্রোশ গেলেও কোন ডাক্তার কবিরাজ নেই।

অগত্যা সব আশা ছেড়ে দিয়ে সকলে ভগবানকে ডাকতে থাকে।

এমনি সময়ে দরজার কাছে এক সাধুকে দেখা গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে সাধু তাঁর থলি থেকে একটু পিপুল আর মধু বের করে খাইয়ে দিলেন স্বামীজীকে।

মুহূর্তের মধ্যে ওষুধের ক্রিয়া হলো আশ্চর্যজনকভাবে। স্বামীজী চোখ খুললেন, কিন্তু এক নিমিষে সেই সাধুকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

মীরাট থেকে সকল গুরুভ্রাতাদের ত্যাগ করে স্বামীজী একলা চলেছেন দিল্লীর পথে।

ঘুরতে ঘুরতে রাজপুতনার আলোয়ার রাজ্যে এসে পৌঁছলেন। রাজ্যের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী সংবাদ পেয়ে খুব আদরযত্ন করে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ী! সেই সংবাদ পেয়ে মহারাজও দেওয়ান বাড়ীতে এসে হাজির।

প্রথম দর্শনেই স্বামীজীর প্রতি ভক্তি জাগে মহারাজের মনে। প্রণাম করে বসলেন মহারাজ। তারপর শুরু হলো আলাপ-আলোচনা। মহারাজ প্রথমেই বললেন,—আচ্ছা স্বামীজী, শুনেছি আপনি প্রচুর লেখাপড়া করেছেন, মহাপণ্ডিত। আপনি অনায়াসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু তা না করে ফকিরী করে বেড়াচ্ছেন কেন? কেনই বা ভিক্ষা করছেন?

স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন,—আপনি রাজকার্যে অবহেলা করে সব সময় সাহেব-সুবোদের সঙ্গে খানা-পিনা ফুর্তি করে বেড়ান কেন?

—আমার ভালো লাগে বলে। বললেন মহারাজ।

—আমারও ফকিরী করতে ভালো লাগে, তাই করি। স্বামীজী বললেন।

মহারাজ আবার কি ভেবে বললেন,—আচ্ছা, আপনি বলুন তো, আমার ঐ কাঠখড়ে তৈরী মূর্তিগুলোর উপর ভক্তি নেই, তাহলে আগামী জন্মে আমি নীচ হয়ে জন্মাব?

স্বামীজী বললেন,—যার যেমন বিশ্বাস। স্বামীজী এদিক-ওদিক

তাকিয়ে দেওয়ালে টাঙান একটা ছবির দিকে তাকিয়ে দেওয়ানজীকে বললেন,—ওটা কার ছবি?

—মহামান্য মহারাজের।

—আনুন তো ওটা আমার কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল থেকে ছবিটা নামিয়ে স্বামীজীর হাতে দিলেন দেওয়ানজী। সকলে ভাবছে ছবি দিয়ে স্বামীজী কি করবেন? স্বামীজী বললেন,—দেওয়ানজী, এই ছবিটির উপর থুথু ফেলুন তো।

ভয়ে শিউরে ওঠেন সকলে!—স্পর্ধিত সন্ন্যাসী বলে কি!

—ও যে আমাদের মহামান্য মহারাজের ফটো, স্বামীজী। এ কি বলছেন আপনি?

—তাতে কি হয়েছে? বললেন স্বামীজী,—স্বয়ং মহারাজ তো নন, একটা ফটো মাত্র।

—হ্যাঁ, কিন্তু তাঁরই তো প্রতিকৃতি ওটা।

—বেশ। তাহলেই দেখুন, বলে সকলের দিকে তাকিয়ে স্বামীজী বললেন,—দেওয়ানজী, এটা শুধু মহারাজের প্রতিকৃতি, মহারাজা নন। তবু এটি দেখলেই মহামান্য মহারাজাকেই স্মরণ হয়। আর সেই জন্যই একে আপনারা কেউ অসম্মান করতে পারেন না। তাহলে এটি যাঁর ছবি, সেই মহারাজকেই অপমান করা হয়।

তারপর মহারাজের দিকে ফিরে বললেন,—মহারাজ! এই ফটোটা স্বয়ং আপনি না হলেও আপনারই ফটো। তাই এ রাজ্যে এমন সাহস নেই কারো যে, এ ছবিকে অবমাননা করে। তার মানে আপনাকে অপমান করা। তেমনি হিন্দুরা যে খড়-কাঠ-মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরী করে পুজো করে সেটা হলো ঐ মূর্তিটা যাঁর, তাঁকেই পূজা করা। মূর্তির মধ্যেই নারায়ণের পূজা করে তারা। পুজোর সময় কেউ একথা বলে না যে, হে মাটি, হে খড়-কাঠ, আমরা তোমার পুজো করছি।

এবার মহারাজ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীজীর দিকে তাঁর মন থেকে আজীবনের এক কুসংস্কারের বোঝা নেমে গেল

মহারাজ তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বামীজীকে প্রণাম করলেন।

এরপর মহারাজের অনুরোধে প্রায় একমাস স্বামীজীকে আলোয়ারে থাকতে হলো। ইতিমধ্যে অনেকেই এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। স্বামীজীর বহু প্রচলিত ও পরিচিত পরিব্রাজকের ফটো এইখানেই তোলা হয়।

আলোয়ার থেকে জয়পুর হয়ে আবু। সেখান থেকে খেতড়ি।

খেতড়ির রাজবাড়ীতে বেশ কয়েকদিন কাটাতে হলো স্বামীজীকে।

খেতড়ি থেকে আজমীড়। আজমীড় থেকে রাজপুতনার মরুময় অঞ্চলে যাত্রা করলেন তিনি। সমগ্র মরুপ্রদেশ পদব্রজে ভ্রমণ করে আহমদা হয়ে লিম্বড়ি এলেন। লিম্বড়ির রাজা মহাসমাদরে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

এরপর জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভাস হয়ে পৌঁছলেন সোমনাথের মন্দির দর্শনে।

সোমনাথ থেকে পোরবন্দর। এখানে একদিন স্বামীজীকে ভিক্ষা করতে দেখে লিম্বড়ির রাজা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। স্বামীজীকে দেখেই তিনি ছুটে এসে স্বামীজীকে প্রণাম করে বললেন,—আমরা থাকতে আপনি ভিক্ষা করবেন?

স্বামীজী হেসে বললেন,—আমি যে সন্ন্যাসী, ভিক্ষায় তো লজ্জা হবাব কথা নয় আমার। তোমারই বা লজ্জা হবে কেন?

কিন্তু মহারাজ নাছোড়বান্দা হয়ে স্বামীজীকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্থানীয় প্রাসাদে। সেখানে স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সময়ে এখানকার খুব বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের সাহচর্যে এসে স্বামীজী সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক অধ্যয়ন করলেন।

এখানে একদিন স্বামী ত্রিগুণাতীতকে দেখে স্বামীজী আনন্দিত হয়ে বললেন,—আরে সারদা যে, আমি এখানে আছি তা তুমি জানলে কেমন করে?

সারদা বললেন,—আমি জানতাম না। একদিন শুনলাম রাজপ্রাসাদে

খুব ইংরাজী জানা একজন বাঙালী পরমহংসদেব অবস্থান করছেন। তাঁকেই দর্শন করতে এসেছিলাম। এসে দেখি, নরেন।

পোরবন্দরে রাজসভায় পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাং নামে একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বামীজীর গুণে এত বেশী মুগ্ধ হয়েছিলেন যে স্বামীজীকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন সাগর পারে যাবার জন্য। তিনি বলতেন,—এদেশে আপনাকে চেনবার, জানবার লোকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। পাশ্চাত্যের লোক আপনাকে মাথায় তুলে নেবে। আপনার এই বিশ্বজয়ী প্রতিভা কি শুধু গুণগ্রাহীর অভাবে চাপা পড়ে থাকবে? আপনি পাশ্চাত্যে গেলে ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করে ফিরবেন।

পণ্ডিতজীর আন্তরিক অনুরোধ স্বামীজীর মনেও আলোড়ন জাগায়। তখন থেকে তিনি পাশ্চাত্যের কথা ভাবতে লাগলেন।

পোরবন্দর থেকে দ্বারকা। দ্বারকা থেকে মাণ্ডবী। তারপর খাণ্ডোয়া।

খাণ্ডোয়া এসে শুনতে পেলেন আমেরিকার চিকাগো সহরে সর্বধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বিরাট ধর্মমহাসভার আয়োজন চলছে। শুনেই স্বামীজীর মনের সুপ্ত আকাঙ্খা আবার জেগে উঠলো।

বোম্বাইতে প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার রামদাস হাবিলদারের বাড়ীতে এসে উঠেছেন স্বামীজী। এখানে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অভেদানন্দকে ডেকে বললেন স্বামীজী—শোন কালী, আমার মধ্যে এমন শক্তি জমে উঠেছে মনে হচ্ছে আমি কবে ফেটে পড়বো।

বোম্বাই থেকে পুনা হয়ে বেলগাঁও। সেখান থেকে সোজা চলে আসেন দাক্ষিণাত্যে। মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোরে। এখানে রাজ্যের দেওয়ান স্যার কে. শেষাদ্রি আয়ারের সঙ্গে পরিচয় হলো। আরো পরিচয় হলো মহীশূর রাজ্যের মুসলমান সভাসদ জনাব আবদুল রহমানের সঙ্গে। মুসলমান হয়েও কোরাণের যে আধ্যাত্মিক ভাব এতদিন তিনি বুঝতে পারেননি তা আজ স্বামীজীর কাছে অতি সহজভাবে বুঝতে পেরে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়েন।

মহীশূরের মহারাজা স্বামীজীর স্পষ্টবাদিতায় এবং যুক্তিবাদিতায় এমন আকৃষ্ট হলেন যে কিছুতেই আসতে দেবেন না। তিনি অকপটে স্বীকার করলেন স্বামীজী জগতের এক অদ্বিতীয় বিস্ময়, এক অচিন্ত্য অকল্পনীয় মহাশক্তির আধার। তিনি একদিন তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন,—আমি আপনার কিছু কাজ করতে চাই বলুন, আমার দ্বারা আপনার কি কাজ হতে পারে।

স্বামীজী বললেন,—মহারাজ, আমি ভারতের আর্থিক কল্যাণ এবং তার আমূল সংস্কার চাই। অতএব আপনার প্রজাদের শিক্ষা ও আর্থিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমার কাজ করা হবে। তাছাড়া ভারতের বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা, দর্শন আর অধ্যাত্মবিদ্যা আমি সেগুলি পশ্চাত্যকে দান করতে চাই। আর বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে নিতে চাই তাদের আধুনিক সম্পদ বিজ্ঞানকে। সেজন্য মনেপ্রাণে আমি নিজেকে প্রস্তুত করছি। চিকাগোতে সর্বধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমি ভারতের হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যেতে চাই। সেজন্যে আপনার শুভেচ্ছাই আমি চাই।

মহারাজ পরমানন্দে স্বামীজীকে উৎসাহ দিলেন।

স্বামীজী চলেছেন এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায়। যেখানেই যান, দলে দলে ছুটে আসে অগুনতি মানুষ স্বামীজীকে দেখতে, আর তাঁর অমৃতমাখা বাণী শুনে নিজেদের ধন্য করতে।

রাজা, প্রজা, আমীর, ফকির, প্রাসাদবাসী আর পর্ণকুটিরবাসী সকলেই এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। স্বামীজীর মনে এতটুকু অহমিকা দেখে নেই। নেই ছোট বড়, উঁচু নীচু ভেদা-ভেদ জ্ঞান।

তিনি সকলকেই বলতেন, হিন্দুধর্ম একটা ভুল নয়। এর মধ্যে ডুব দিয়ে দেখ, তার গভীরতম প্রদেশে অনুসন্ধান করে দেখ তখন বুঝতে পারবে কতখানি অতলস্পর্শী মহাসমুদ্র এই হিন্দুধর্ম। আগে নিজেকে বোঝো, নিজের জাতিকে বোঝো, বুঝতে শেখ তোমার জীবনের গতি কোন্ পথে।

কোচিন থেকে মাদুরা হয়ে রামেশ্বরম্ গেলেন স্বামীজী। এখানকার বিশ্ববিখ্যাত শিবমন্দির দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন যেন।

সেখান থেকে কন্যাকুমারী। পথে আবার দেখা হলো স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে। তাঁকে কাছে পেয়ে প্রাণের আবেগ আর চেপে রাখতে পারলেন না স্বামীজী, দীর্ঘদিন পদব্রজে ভারতের কোণে কোণে ভ্রমণ করে নিজের চোখে দেখেছেন ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা, ধর্মের অবনতি। একে একে বলে ফেললেন সব কথা।

অপার বিস্ময়ে স্বামীজীর মুখের দিকে চেয়ে অভেদানন্দ বললেন, কিন্তু ভাই তোমার এত আকুলতা কেন? আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের এইসব চিন্তা করতে গেলে সাধনার ব্যাঘাত হবে। আমাদের একমাত্র চিন্তা ঈশ্বর লাভ। ভারত বা ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ?

স্বামীজী গম্ভীর হয়ে গেলেন গুরুভাইয়ের কথা শুনে। তিনি বললেন, ধর্ম মানে তোমরা কি বোঝো তা আমি জানিনা। শুধু নিজের ধর্ম পালন করলেই কি সব কর্তব্য শেষ? না না, তা নয়, সমগ্র দেশবাসীর ধর্ম কিসে রক্ষা পায় সেটা দেখা আমাদেরই কর্তব্য। যাঁর আশিষ বাণীকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তিনিও ঐ কথা বলতেন। আমাদের কাছে ধর্ম মানে যুগব্যাপী নির্যাতিত, জীর্ণ, পঙ্গু চিত্তে আনন্দের ভাব জাগিয়ে তোলা। আমাদের ধর্ম মানে, দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব মানুষের সেবা করা। জ্ঞান বিতরণ করা, জীর্ণ দেহে শক্তি দেওয়া। দিকে দিকে মানুষই যদি মরে পচে গেল তাহলে এই মঠ মন্দির আর সাধন ভজন দিয়ে কি করবো।

স্বামী অভেদানন্দ ধর্মের এই ব্যাখ্যা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্বামীজী জলভরা চোখে আবার বললেন, তুমি যে ধর্মের কথা বলছো, সে ধর্ম আজ আমাদের কাছে নয়। আমাদের অভাব শুধু অন্ন বস্ত্রের আর শিক্ষার। আচ্ছা ভাই, তুমি তোমার গন্তব্য পথে এগিয়ে যাও। আমার যেটুকু শক্তি আছে চেষ্টা করে দেখি, তাই দিয়েই নতুন ধর্ম প্রচার করবো।

স্বামীজী এলেন কন্যাকুমারী। কথিত আছে, দেবী ভগবতী এখানেই নাকি কুমারীরূপে সাধনা করেছিলেন তাঁর চির আরাধ্য দেবাদিদেব মহেশ্বরকে। মহাদেব তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মিলিত হতে চাইলেন। কিন্তু ভগবান শঙ্কর ওখানে গিয়ে দেবীর সঙ্গে মিলিত হলে সৃষ্টির কাজ ভুলে যাবেন এই আশঙ্কায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁদের মিলনে বাধার সৃষ্টি করেন। দেবীর আর মিলন হলো না। তিনি কুমারীই রয়ে গেলেন। দেবীর কুমারী মূর্তি পূজা হয় এখানে। তাই এখানকার নাম হয়েছে কন্যাকুমারী।

মন্দিরের পাদদেশে পাথর খণ্ডে সমুদ্রের তরঙ্গ আছাড় খেয়ে পড়ছে। পিছন দিকে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, সামনে অখণ্ড জলরাশি। এখানে এই নীরব প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে আসমুদ্র হিমালয় ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করলেন স্বামীজী। একখানা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে স্বামীজীর মনে হলো আর কেন, এবার এখানেই দেহত্যাগ করি? কিন্তু তখুনিই মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—তোমার কাজ শেষ হয়নি এখনো।

চমকে উঠে প্রস্তরখণ্ড থেকে নেমে এসে মন্দিরের পাদদেশে মাথা নত করে প্রণাম করেন স্বামীজী। আবার এগিয়ে চললেন তিনি তাঁর কর্মের পথে। আঠারো শ' নিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দ তখন বিদায়ের পথে।

এরপর মাদ্রাজে এসে পৌঁছতেই মাদ্রাজী যুবকরা দলে দলে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলো। অভূতপূর্ব তাদের সেই আগ্রহ সার্থক হলো স্বামীজীকে দর্শন করে। মাদ্রাজে বহুলোক এসে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যুবসমাজের মধ্যেই তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো সবচেয়ে বেশি। তখন স্বামীজী তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, একমাত্র যুবসম্প্রদায়ই পারে দুর্গম বন্ধুর পথ জয় করতে, পারে অসাধ্য সাধন করতে। হিন্দুধর্মকে জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরবার সময় এসেছে। আগামী সর্বধর্ম মহাসম্মেলনে আমি যাবো হিন্দু প্রতিনিধি হয়ে, কিন্তু পথে খরচের জন্যে চাই অর্থ।

মুহূর্তে তরুণ ভক্তরা পাঁচশো টাকা চাঁদা তুলে স্বামীজীর হাতে

দিলেন। স্বামীজী সে টাকা তাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—আমি সাগর পারে যাবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জগদম্বার কোনো নির্দেশ পাইনি। তোমরা আপাততঃ এই অর্থ গরীব দুঃখীদের দান করে দাও, প্রয়োজন হলে পরে তোমাদের জানাবো।

অভিভূত, অনুগত শিষ্যেরা অগত্যা চুপ করে গেল। স্বামীজীও পূর্ণ উদ্যমে লোকশিক্ষার কাজ করে যেতে লাগলেন।

হায়দ্রাবাদে এসে রাজোচিত সম্মান পেলেন স্বামীজী। সমস্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক এসে স্বামীজীর আনুগত্য স্বীকার করে হাজার হাজার টাকা দিতে চাইলেন স্বামীজীর অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে।

স্বামীজী অত্যন্ত বিনীতভাবে আপাততঃ সে দান গ্রহণে বিরত থাকলেন।

তিনি বললেন, আমি দরিদ্রের প্রতিনিধি। রাজা মহারাজার দান নিয়ে বিদেশে যাত্রা করা আমার শোভা পায় না। তবুও সময় হলে আমি নিজেই জানাবো আপনাদের আমার প্রয়োজনের কথা।

যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে হায়দারাবাদবাসী অভিভূত হলেন।

১৮৯৩ সালে মার্চ এপ্রিল মাস নাগাদ মাদ্রাজী তরুণ দল চাঁদা তুলতে শুরু করলো। স্বামীজী দেখলেন যুবসম্প্রদায় নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চাঁদা তুলছে। তাহলে এর মধ্যেই কি রয়েছে জগদম্বার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত?

তখন তিনি শ্রীশ্রীমার কাছে চিঠি লিখে জানালেন তাঁর ইচ্ছার কথা। শ্রীমা'ই তো ঠাকুরের প্রতিনিধি। তাঁর নির্দেশ হবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ।

উত্তরে শ্রীমা লিখলেন,—আমি স্বপ্ন দেখছি, ঠাকুর তোমার কাজে আশীর্বাদ করছেন, আমিও আশীর্বাদ করছি। তুমি তাঁরই কাজে এগিয়ে যাও। ঠাকুরের আশীর্বাদই হবে তোমার চলার পথের রক্ষাকবচ।

উত্তব পেয়ে মাতৃ আজ্ঞা ও আশীর্বাদ পেয়ে পরম আশ্বাসে স্বামীজীর বুক ভরে ওঠে। তিনি নির্দেশ পেয়েছেন আমেরিকা যাবার। তখুনি শিষ্যদের ডেকে বললেন। শিষ্যদের উৎসাহ বেড়ে

গেল শতগুণে। প্রচুর উদ্যমে তাঁর আমেরিকা যাবার আয়োজন চলতে লাগলো।

অতঃপর এগিয়ে এলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই শুভদিন, পুণ্যলগ্ন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে। পেনিনসুলার জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করে অসীম সমুদ্রের বুকে যাত্রা করলো।

বন্দরে স্বামীজীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলেন মাদ্রাজ যুব-সম্প্রদায়ের নেতা আলাসিঙ্গা পেরুমল! খেতড়ির রাজদেওয়ান গজমোহনলাল। খেতড়ীর মহারাজ স্বামীজীর জন্যে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আর রাজগুরুর পরিচ্ছদ পাঠিয়েছেন। গজমোহনলাল মনের আনন্দে স্বামীজীকে রাজগুরুর বেশে সাজিয়ে প্রচুর অর্থ দিলেন দেশের কল্যাণে খরচের জন্য। জাহাজ ছাড়বার মুহূর্তে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণ রেশমী আলখাল্লা ও পাগড়ী ভূষিত রাজেন্দ্রবেশী বেদান্তবাদী সর্ব বন্ধন মুক্ত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বদেশ ও স্বজন ছেড়ে সাগরপারে সুদূর বিদেশে নিঃসঙ্গ যাত্রার প্রাক্কালে বেদনায় তার চোখে জলের ধারা নেমে আসে। মনে মনে প্রণাম করলেন তার জীবনের আকাশের ধ্রুবতারা প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে। প্রণাম করলেন আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী মা সারদামণিকে আর স্বর্গাদপী গরীয়সী জননী ভুবনেশ্বরীকে। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটে উঠলো গুরুভাইদের প্রতি।

ভারতমহাসাগরের অশ্রান্ত গর্জন উপেক্ষা করে জাহাজ এগিয়ে চলেছে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। মাঝে মাঝে এক জায়গায় জাহাজ আসে আর স্বামীজী সুবিধা মত ঘুরে ফিরে দেখে আসেন।

জাপানের বন্দরে এসে জাপানীদের দেখে খুব খুশী হলেন তিনি। সেখান থেকেই তিনি মাদ্রাজের তরুণ শিষ্যদের চিঠিতে লিখলেন, তোমারা সারাজীবন কেবল বাজে বকছো আর বাজে সময় নষ্ট করছো। ভারতের জরাজীর্ণ অবস্থায় তোমাদেরও ভীমরতি ধরেছে। একবারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও।

কি আছে তোমাদের ? ইওরোপ মস্তিস্কপ্রসূত সকল চিন্তার বদহজম ক্রমাগত আওড়াচ্ছ আর তিরিশটাকা মাইনের কেরাণীগিরিতে ভবিষ্যভের স্বপ্ন দেখছো ? তোমরা এসো। সঙ্কীর্ণতার গর্ত থেকে নিজেদের বার করে এনে বাইরের জগৎ দেখ। দেখ একের পর একটা জাতি কেমন উন্নত হচ্ছে, তোমরা ক্রমাগত অধঃপাতের দিকে চলেছ। চলে এসো সব ছেড়ে দিয়ে। প্রিয়জনেরা কাঁদে কাঁদুক, পিছনে চেয়োনা। মানুষ হও তোমরা।

ইয়াকোহামা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে চলেছে জাহাজ।

দেখতে দেখতে কানাডায় এসে নোঙর করলো। এখান থেকে রেলে তিনদিনের পথ চিকাগো। স্বামীজীর গন্তব্যস্থান চিকাগো।

চিকাগোয় এসে স্বামীজী বিপদেই পড়লেন। এখানে সাদা কালোর ভীষণ ভেদাভেদ। তার গেরুয়া আলখাল্লা পরা মাথায় পাগড়ী বাঁধা চিকাগোবাসীর অন্তরে এক বিজাতীয় বিদ্বেষের সঞ্চার করলো। কেউ কথা বলেনা, কেউ পথ দেখিয়ে দেয়না। রাস্তায় চলবার উপায় নেই। ছেলেরা দেখলে পাগল বলে তাড়া করে আসে। কেউ বা ঢিল ছোঁড়ে। অবশেষে কষ্টে একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়ে রাস্তার উপদ্রবের হাত থেকে বাঁচলেন। কিন্তু সেখানেও বিপদ! অফুরন্ত বিলাস বৈভবের লীলাকেন্দ্র এই সহরের হোটেলের খরচ যোগানো একজন নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব নয়।

এমনি করে বিস্তর অসুবিধার মধ্যেও বারোদিন কাটালেন। ইতিমধ্যে এখানকার দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু অর্থ ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে, অথচ মহাসভা অনুষ্ঠানের এখনো তিন মাস বাকী। স্বামীজী বুঝলেন, ভাল করে জেনে শুনে প্রস্তুত না হয়ে এই ভাবে ভেলায় চেপে সাগর পাড়ি দেওয়া ভুল হয়েছে।

কিন্তু তাই বলে দমবার পাত্র নন তিনি। স্বামীজী জানতে পারলেন চিকাগোর চেয়ে বোষ্টন সহরে খরচ কম। তাই তিনি চললেন বোষ্টনে।

সৌভাগ্যবশতঃ ট্রেনের কামরায় এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হতে তিনি আগ্রহভরে স্বামীজীকে নিজের বাড়ীতে এনে আশ্রয়

দিলেন। অবশ্য এই অনুগ্রহের পিছনে তাঁর মনের ইচ্ছা ছিল এশিয়াবাসীর এই অদ্ভুত জীবটিকে বন্ধু-বান্ধবদের দেখানো।

তবুও খরচের ব্যাপারটার অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেল। এদিকে সামনে শীত এসে পড়লো। গরম পোষাক নেই তাঁর। তখন তিনি মাদ্রাজী শিষ্যদের চিঠি লিখলেন—হয় তিনমাস থাকার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাও--নতুবা অন্ততঃ ফিরে যাবার মত অর্থ চাই।

এমন সময় পরিচয় হলো, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার প্রফেসর জি. এইচ. রাইটের সঙ্গে। স্বামীজীর সংগে আলাপ আলোচনা করে তিনি মুগ্ধ হয়ে বললেন—ধর্ম্মমহাসভায় যোগ দেওয়া আপনার মত ব্যক্তিরই উচিত।

কিন্তু স্বামীজী সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন কোন নিদর্শন পর্যন্ত নেই যা দেখিয়ে অন্ততঃ পরিচয় দেওয়া যায়।

আশ্চর্য হয়ে রাইট সাহেব বললেন,—আপনার কাছে নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যের কিরণ দেবার কি অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা একই কথা। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি আপনাকে। চিকাগোর প্রতিনিধি নির্বাচন সভার সভাপতি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আপনাকে সকল ব্যবস্থা করে দেবেন।

তিনি লিখলেন,—"এই তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী এমন একজন জ্ঞানী ও মেধাবান পুরুষ যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপকদের জ্ঞান একত্র করলেও এর সমতুল্য হওয়া অসম্ভব।"

চিঠি নিয়ে স্বামীজী চললেন চিকাগোয়। কিন্তু হায়, চিকাগোয় পৌঁছে সেই চিঠিখানা আর খুঁজে পেলেন না তিনি। দারুণ দুঃখে মন ভেঙ্গে পড়ে। এতোবড়ো সহরে ঠিকানা না জানা থাকলে কিছুই সম্ভব নয়। অথচ রাত্রি হয়ে এসেছে। পথে পথে কতক্ষণ ঘোরা যায়। দারুণ শীতে হাত পা অবশ হয়ে আসতে থাকে। চারিদিকে বরফ জমে রয়েছে।

অবশেষে একটু আশ্রয়ের জন্যে একটা হোটেলে ঢুকলেন স্বামীজী। কিন্তু হোটেলওয়ালা তাঁকে নিগ্রো মনে করে তাড়িয়ে দিল। শ্রান্ত দেহ, অবশ চরণ, ক্ষুধায় দুর্বল দেহ নিয়ে আর চলতে পারেন না। এমন

সময় পাশে একটা মালগুদামের দরজার কাছে একটা ভাঙ্গা বাক্সের মধ্যে ঢুকে কোনোপ্রকারে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে রইলেন। চোখের সামনে শুধু ভেসে রইলো পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বরাভয় মূর্তি।

সকাল হতে কিছু খাবারের আশায় দরজায় ভিক্ষে করতে লাগলেন। কিন্তু না, ভিক্ষার বদলে তিনি কেবল ঘৃণা পেলেন। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে রাস্তার পাশে নিরাশ হয়ে বসে পড়লেন। আকুল হয়ে বলতে লাগলেন—ওগো, তোমরা কেউ ভিক্ষা দাও বা না দাও অন্ততঃ ধর্মমহাসভার ঠিকানাটা বলে দাও।

এমন সময়ে সামনের বিরাট প্রাসাদ তুল্য বাড়ীটার জানলা খুলে অনিন্দ্যসুন্দরী এক মহিলা মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কি মহাসভার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন?

এমন মধুব স্বর কখনো শোনেননি স্বামীজী। শ্রদ্ধায় তাঁর দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ মা, আমি প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি বটে, কিন্তু কার্যালয়ের ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলে এই দুর্গতি ভোগ করছি।

আচ্ছা, আপনি বাড়ীর মধ্যে আসুন। বললেন সেই দয়াময়ী মহিলা।

স্বামীজী বাড়ীর মধ্যে যেতেই তিনি চাকরদের আদেশ করলেন স্বামীজীকে পরিচর্যা করতে। তারপর নিজে তত্ত্বাবধান করে পরম আদরে ভোজন করালেন স্বামীজীকে। এবার স্বামীজী সুস্থ হলেন।

চিকাগো সহরের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিঃ জর্জ ডব্লিউ হেলের পত্নী মিসেস হেল এই অনন্যা মহিলা।

বিশ্রামের পর মিসেস হেল স্বামীজীকে নিয়ে সদর কার্যালয়ে গেলেন এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে সসম্মানে হিন্দুধর্মে প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হতে সাহায্য করলেন স্বামীজীকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বামীজীর বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

এবার সাফল্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে আর সন্দেহ রইলো না। তিনি জানতেন—'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'—প্রত্যেক শুভকাজে বাধা

বিঘ্ন এসে থাকে, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর মঙ্গলহস্ত বিস্তার করে আছেন ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য।

বিশাল বিশ্বের একশত কুড়ি কোটি নরনারীর প্রতিনিধিরূপে মহা মহা পণ্ডিত আসন অলঙ্কৃত করে বসেছেন বিশ্বধর্ম মহাসভায়।

খ্রীষ্ট, হিন্দু, জৈন, ইহুদি, বৌদ্ধ, মহম্মদীয়, পারসী, কংফুছোর, শিন্তো প্রভৃতি ধর্ম প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়েছেন। সকলের মাঝে বসেছেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মাধিনায়ক কার্ডিনাল গিবন্স।

ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ মজুমদার, জৈন সমাজের বীরচাঁদ গান্ধী, থিওসফির প্রতিনিধি য়্যানি বেশান্ত আর চক্রবর্তী, বোম্বাইয়ের নাগরকার আর হিন্দু প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ, সিংহল থেকে বৌদ্ধ ধর্মপাল। সকলের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ বিবেকানন্দ; মাত্র ত্রিশ বৎসর তাঁর বয়স।

প্রার্থনা সঙ্গীতের পর সভার কাজ আরম্ভ হলো। সভাপতির নির্দেশে বক্তারা একে একে তাঁদের বক্তব্য বলে যেতে লাগলেন। যাঁর যাঁর বক্তব্য তাঁরা আগে থেকে গুছিয়ে রেখেছিলেন, তাই বলবার সময়েও সুন্দর বলে যেতে লাগলেন। বিবেকানন্দ কি বলবেন তার কিছুই চিন্তা করেননি। প্রথমে কাজটা যত সহজ ভেবেছিলেন এখন দেখলেন তত সহজ নয়।

অগত্যা নীরবে বসে তিনি পরমেশ্বরের ধ্যান করতে লাগলেন। স্মরণ করলেন বাক্যের দেবী ভারতীকে, অপেক্ষা করতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশের।

এমন সময় সভাপতি স্বামীজীকে বলতে আহ্বান করলেন। স্বামীজী ঘাড় নেড়ে বললেন, এখন নয়। পরে আরও দু-তিনবার আহ্বান করলেন, কিন্তু প্রতিবারই স্বামীজী বললেন,—এখন নয় পরে। সকলে ভাবলেন স্বামীজীর হয়তো সাহস হচ্ছে না। অবশেষে সভাপতি জানালেন এইবার স্বামীজী না উঠলে তিনি আর সময় দিতে পারবেন না।

অগত্যা স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে তাঁর মন ভরে উঠেছে সেই অনন্ত শক্তির গভীর প্রেরণায়। মনে মনে বিশ্বপিতার চরণে প্রণাম জানিয়ে স্বামীজী তাকালেন বিশাল জনতার দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত সকল নরনারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে। আজীবন ব্রহ্মচারী যোগসিদ্ধ, 'গৌরকান্তি দেহে লোহিত রঙের আংরাখা' মাথায় গেরুয়া রঙের রেশমী উষ্ণীষ। প্রশান্ত সৌম্য চেহারায় অপূর্ব দ্যুতি ঝলসে পড়ছে। আয়ত চোখে প্রজ্ঞা দীপ্ত দৃষ্টি।

ভারতীয় প্রথায় অভিবাদন জানিয়ে স্বামীজী বললেন,—Sisters and Brothers of America। হে আমার আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনসকল।

স্বামীজীর কথা শেষ হতে চারিদিকে থেকে হাজার হাজার নরনারী বিপুল শব্দে করতালি দিতে দিতে পরম উল্লাসে কলগুঞ্জন শুরু করে। সেই উল্লাস যেন আর থামতে চায় না।

বিশ্বের বহু বড় বড় পণ্ডিতেরা তো বহুকথা বলে গেলেন, কিন্তু এমন বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিশ্ব প্রেমের প্রগাঢ় একাত্মবোধক ত' কারো ভাষায় প্রকাশ পায়নি। এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বোধ ত' প্রকাশ পায়নি কারো।

সভার কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় কলগুঞ্জন থামলে স্বামীজী উদাত্তকণ্ঠে শুরু করলেন তাঁর কথা। বিশুদ্ধ ইংরাজীতে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে অপূর্ব বচনভঙ্গীমায় আর অনর্গল গতিতে খুব সংক্ষিপ্ত করে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে কথা তিনি বললেন, যে কথা তিনি জানালেন, তা, শুনে অর্ধেক পৃথিবী তাঁর অসীম শক্তির কাছে মাথা নত করলো— এ কথার সাক্ষ্য অনন্তকাল ধরে লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

মাত্র কয়েকদিন আগে যে মানুষটি কপর্দকশূণ্য হয়ে নানাভাবে চিকাগোর রাস্তায় অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েছেন। তার পরদিন সেই মানুষটির ছবি ছাপা হলো অসংখ্য সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়, দেওয়ালে দেওয়ালে, প্রাচীরপত্রে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের নাম। উড়তে লাগলো হিন্দুধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী পতাকা।

তার পরদিন থেকে যে কদিন অধিবেশন চলছিল সেই কয়দিনই বিবেকানন্দের অগাধ পাণ্ডিত্যে আর অসাধারণ প্রতিভার জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে চিকাগোর মহাসভা। হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসতে থাকে একটিবার শুধু দর্শন করবার আশায়।

বেদান্তের অপূর্ব ব্যাখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পরম উপদেশের বিশ্লেষণে উপেক্ষিত হিন্দুধর্মকে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন গরিমার স্বর্ণসিংহাসনে।

ঠাকুরের শ্রীচরণতলে বসে বিবেকানন্দ শিখেছিলেন, 'যত মত তত পথ'—তিনি সেই কথাই শোনালেন সকলকে। সকল ধর্মের গন্তব্যস্থান এক। যে যেখানে আছে তেমনিভাবেই থাকবে। তার জন্য কোন খ্রীষ্টানকে বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেককে নিজ নিজ বিশেষত্ব ত্যাগ না করে উদারচিত্তে অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে ও উন্নত হতে হবে। বিকাশের এই একমাত্র পথ।

স্বামীজী আরো বললেন,—সৃষ্টি অনাদি ও তার বিশ্ব প্রসবিনী শক্তি (Cosmic Energy) মোটের উপর হ্রাসবৃদ্ধিহীন। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুইটি সমান্তরাল রেখার মতই পাশাপাশি চলছে। মানুষ মাত্রেই আত্মা। সুতরাং স্বরূপতঃ মানুষ ও পরমাত্মায় কোনো প্রভেদ নেই। ধর্ম কোনো মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ধর্ম অনুভূতি সাপেক্ষ। পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদগুণগুলি কোনো ধর্মেরই নিজস্ব নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেই উন্নত চরিত্রের নরনারীর আবির্ভাব হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। এই প্রমাণের পরেও যদি কেউ ভেবে থাকেন যে তাঁর ধর্মই টিকে থাকবে আব সকল ধর্মউচ্ছন্নে যাবে তাহলে তাঁকে আমি করুণার পাত্র বলে বিবেচনা করি। অন্যের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকল ধর্মের পতাকায় লেখা থাকবে—সমর নহে সহায়তা, বিনাশ নহে বরণ, দ্বন্দ্ব নহে শান্তি ও মিলন। হিন্দুধর্ম কোনো ধর্মকে ঘৃণা করে না বা ছোট বড় ভাবে না। বরং অন্য যা কিছু ভালো তাকে গ্রহণ করতে চায়। বিশ্বমানবের কল্যাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বেদান্ত—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।' খৃষ্টধর্ম মানুষকে যেখানে পাপী বলে, হিন্দুধর্ম সেখানে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে।

বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে নিউইর্কের হেরল্ড' পত্রিকা লিখলো —এমন সুশিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক পাঠানো নির্বুদ্ধিতা ধর্মজগতে ভারতকে অন্যধর্মের দেবার মত কিছুই ত নেইই বরং ভারত মুক্তহস্তে অন্যকে দান করতে পারে ক্রমাগত।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নৈরাশ্যের সুর—বিবেকানন্দের মত মানুষের জন্ম যেখানে, সেই ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় পাদ্রী পাঠানো মূঢ়তা ছাড়া আর কি ?

কিন্তু পৃথিবীর সবদেশেই আছে পরশ্রীকাতর নিন্দুকের দল। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজ শুরু করে দিল পূর্ণোদ্যমে। তারা নানাপ্রকারে কুৎসা রটনা করতে আরম্ভ করলো। এমন কি একজন ভারতবাসী যিনি এই ধর্মসভার অন্যতম প্রতিনিধি; তিনিও যথেচ্ছভাবে স্বামীজীর নামে বিদ্বেষ প্রচার করতে লাগলেন।

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আরো একধাপ নীচেয় নেমে গেলেন। তারা কয়েকজন সুন্দরী নষ্টা স্ত্রীলোককে পাঠালেন স্বামীজীর কাছে তাঁকে অপদস্থ করতে। স্বামীজী তাদের মাতৃ সম্বোধনে মধুর ভাষণে বিদায় দিলেন। চিরব্রহ্মচর্যশীল জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের তেজের সামনে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। উপরন্তু ক্ষমা চেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় নিল।

এরপর যুক্তরাষ্ট্রের নানা জায়গা থেকে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান আসতে থাকে স্বামীজীর কাছে। এমনকি বক্তৃতা নিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। টিকিট বিক্রী হতে থাকে বক্তৃতা শোনার জন্য। বিক্রী টাকার একটা সামান্য অংশ পান স্বামীজী। তবুও বক্তৃতার সংখ্যা বেড়ে চলে। চিকাগো, আইওয়া সিটি, ডিসময়েনিকা, ইণ্ডিয়ানা, পোলিশ, সেণ্ট লুই, ডেট্রয়েট, গর্টফোর্ড, বাফেলো, বোষ্টন প্রভৃতি জায়গা ঘুরে ঘুরে বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করতে লাগলেন ধর্মের মাহাত্ম্য। সব জায়গাতেই বিরাট জনতা বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

এমনি করে সমগ্র আমেরিকাবাসীর মন জয় করলেন স্বামীজী। বিদ্যুৎগতিতে জগৎময় ছুটে চলেছে বীর বিবেকানন্দের বিবেক বাণী। সমগ্র বিশ্ব বিস্মিত হয় সে সংবাদ শুনে।

ভারতেও সেই খবর এসে পৌঁছতে দেরী হয় না। মাদ্রাজ আর কলকাতা আনন্দে উথলে উঠেছে যেন। মাদ্রাজী যুবকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্বামীজী সাগরপারে যাত্রা করেছিলেন। মাদ্রাজের রাজা রামস্বামী মধুলিয়ার এবং স্যার সুব্রাহ্মণ্যম আয়ারের নেতৃত্বে বিরাট এক অভিনন্দন সভার আয়োজন করা হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগ দেন। সভার শেষে স্বামীজীকে অভিনন্দন পত্র পাঠানো হয় তারযোগে। কলকাতায়ও এমনি বিরাট এক সভার আয়োজন করে অভিনন্দন পাঠানো হয়।

এরপর বক্তৃতা প্রতিষ্ঠানের সংস্রব ত্যাগ করে স্বামীজী নিয়মিত বেদান্তের ক্লাশ খুললেন নিউইয়র্কে। বহু শিষ্য-শিষ্যা তাঁর চরণতলে বসে ভারতের অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা শুরু করে। তিনি বেশির ভাগ রাজ যোগ ও জ্ঞান যোগ শিক্ষা দিতেন। সকলকে বোঝাতেন ধর্ম শুধু বিশ্বাস মাত্র নয়। ধর্ম গভীর অনুভূতির বিষয়। এছাড়া ধ্যান ও যোগ অভ্যাসের জন্যও শিষ্যদের উপর জোর দিতেন। তিনি বলতেন— "নদ-নদীসকল ভিন্ন ভিন্ন পথে সাগরাভিমুখে যায়। তেমনি রুচির বৈচিত্র্যের জন্য সরল বা কুটিল নানাপথগামী মানুষেরও তিনিই একমাত্র গন্তব্যস্থল।"

ইতিমধ্যে যারা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, মিসেস ওলি বুল, ডাঃ এলান ডে, মিস এস, ই, ওয়াল্ডো, প্রফেসর ওয়াইম্যান, প্রফেসর রাইট, ডাঃ ষ্ট্রীট, ম্যাডাম মেরী লুই, হার লিঁও ল্যান্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রচারের সুবিধার জন্য স্বামীজী মেরী লুই ও হার লিঁও ল্যান্সকে প্রকাশ্যে দীক্ষিত করলেন সন্ন্যাসমন্ত্রে। দীক্ষাদানের পর ওদের নাম দিলেন স্বামী অভয়ানন্দ এবং স্বামী কৃপানন্দ।

নিউইয়র্ক ছেড়ে স্বামীজী এলেন লণ্ডনে। এখানেও নিয়মিত

বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং ক্রমশঃ তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। তাঁর 'আত্মজ্ঞান' নামক বক্তৃতার পর চারিদিকে জয় জয়কার পড়ে যায়।

এই সভায় মিস মার্গারেট নোব্‌ল নাম্নী এক ইংরাজ দুহিতা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতেন নিয়মিত। কিন্তু স্বামীজীর বক্তব্যের মর্মার্থ যথাযথ বুঝতে পারতেন না। তবুও তিনি মনে মনে স্বামীজীকে গুরুর আসনে বসিয়ে পূজো করতেন ভক্তিভরে।

এমনি একদিন এক অভিজাতবংশীয়া মার্কিন তরুণী স্বামীজীকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। উত্তরে, স্বামীজী বললেন,—ভদ্রে আমি সন্ন্যাসী, জগতের সকল নারীই যে আমার মা! এরপর আর কেউ সাহস করেনি এমন শব্দ উচ্চারণ করতে।

লণ্ডনে থাকাকালে মহাপণ্ডিত মোক্ষমূলার-এর কাছ থেকে সাদর আমন্ত্রণ পান স্বামীজী। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বিশেষ আনন্দিত হন।

অতঃপর মিস মার্গারেট, মিস এইচ মূলার প্রভৃতি স্বামীজীর কাছে এসে পরিপূর্ণ অন্তরে তাঁদের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে স্বীকৃত হলেন।

মার্গারেট ছায়ার মত স্বামীজীকে অনুসরণ করতে লাগলেন। স্বামীজীর প্রতিটি বাণী লিখে রাখতেন তিনি, এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে তা অধ্যয়ন করতেন। স্বামীজীর কাছে শিক্ষা পেয়ে মার্গারেটের আজীবনের শিক্ষা দীক্ষার মোড় ঘুরে যায়। স্বামীজীর কাছে নতুন কথা শুনলেন মার্গারেট—আত্মা অবিনশ্বর, অক্ষয়-অমর; এর বিনাশ নেই। অস্ত্রশস্ত্র পারে না তাকে ছেদন করতে, আগুন পারে না তাকে দহন করতে, জলে, উত্তাপে বা বায়ুতে তার বিনাশ নেই। ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা মার্গারেটের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায় স্বামীজীর অপূর্ব বিশ্লেষণে।

স্বামীজীও ক্রমশঃ মার্গারেটকে ভালবেসেছিলেন তাঁর মানসকন্যা-রূপে, তাই আলাপ আলোচনায় তিনি মনেপ্রাণে আপনার মত, সর্বান্তঃকরণে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

একদিন কথায় কথায় ভারতের প্রাচীন তীর্থগুলির কথা উঠতে, মার্গারেট বললেন,—পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডনের তুল্য সহর আর নেই সব দিক দিয়েই।

স্বামীজী বললেন, নিশ্চয়, তুমি যা বলছ তা বর্ণে বর্ণে সত্য কিন্তু You have blasted other cities to make this city of your beautiful তোমাদের এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে কত দেশের কত নগর পুড়ে ছাই হয়েছে তার হিসাব রাখো? একটিকে সুন্দর গড়ে তোলার জন্য আর পাঁচটিকে ধ্বংস করার নাম সৃষ্টি নয়, তাতে নেই এতটুকু কৃতিত্ব। সেটা নির্মম পরিহাস। হে আমার প্রিয় শিষ্য শিষ্যাগণ, তোমরা চিরদিন এই কথা মনে রাখবে? চির সত্যের বাণী একথা।

এরপর স্বামীজী আসেন সুইজারল্যাণ্ডে। তারপর একের পর এক ভ্রমণ শেষ করে ভারতে ফিরবার ইচ্ছা করলেন। স্বামীজীর প্রিয় ভারতবর্ষ তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষ, সর্বতীর্থের সারতীর্থ ভারতবর্ষ ডাক দিয়েছে। যাবার কথা শুনে অগণিত শিষ্য শিষ্যা ও গুণমুগ্ধেরা এসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। কেউ কেউ তার সঙ্গে ভারত-যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

স্বামীজী সকলকে বললেন, তিনি আবার তাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। চারিদিক বীর বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

স্বামী অভেদানন্দকে ডেকে তাঁর আরব্ধ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন স্বামীজী।

লণ্ডন ত্যাগ করে একের পর এক সশিষ্য স্বামীজী ডোভার ক্যালে, মণ্টসেনিস, মিলান, রোম ভ্রমণ করে নেপলস পৌঁছলেন। নেপলস থেকে ৩০শে ডিসেম্বর জাহাজ ছাড়লো ভারত অভিমুখে।

১৮৯৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী কলম্বো বন্দরে জাহাজ নোঙর করলো। দীর্ঘদিন পর মাতৃভূমি স্পর্শ করে স্বামীজী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। এরপর যেখানেই যান, সহস্র সহস্র লোক

মালা আর ফুলচন্দন নিয়ে আসেন জয়তিলক পরাতে, অভ্যর্থনা জানাতে। সে আনন্দপ্রকাশের তুলনা পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে বিরল।

স্বামীজী যেদিন মাদ্রাজ পৌঁছলেন সেদিন মাদ্রাজবাসীর আনন্দের তুলনা হয় না। সমগ্র মাদ্রাজবাসী এক মুহূর্তে উথলে উঠলো মহাপ্লাবনের মত। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ধ্বনিত হতে থাকে "জয় স্বামীজীর জয়।" সমগ্র নগরময় বিরাট বিরাট তোরণের মধ্য দিয়ে ষ্টেশন থেকে বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে স্বামীজীকে নিয়ে যাওয়া হলো।

মাদ্রাজ ছেড়ে স্বামীজীর জাহাজ থামল খিদিরপুরে। এখানেও হাজার হাজার উৎসুক জনতা অপেক্ষা করছে তাঁর দর্শনের জন্য। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। আর কিছু দেখা যায় না। অসংখ্য জনকণ্ঠের মিলিত কোলাহলে যেন মহাসিন্ধুর বুকে গভীর কল কল্লোলের মত মনে হয়। বিশ সহস্র মানুষ একসঙ্গে মাথা নত করে প্রণাম জানায় বিশ্ববন্দিত বাঙালী বীর বিবেকানন্দকে।

অথচ যেদিন সাগরপারে রওয়ানা হয়েছিলেন সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী "নরেন জগৎ মাতাবে"—সার্থক করে বিশ্ববিজয় করে ফিরে আসবে।

খিদিরপুর থেকে বিরাট শোভাযাত্রা করে স্বামীজীকে নিয়ে আসা হয় সহর পরিভ্রমণ করতে করতে। চারিদিক থেকে অজস্র ফুলের মালা আর রাশি-রাশি ফুলের বৃষ্টি হতে থাকে। ধ্বনিত হতে থাকে, "জয় বীর বিবেকানন্দের জয়।"

বাগবাজারের রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাড়ীতে স্বামীজী তাঁর গুরু ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে আলম বাজারের মঠে রওয়ানা হলেন। পাশ্চাত্য শিষ্যদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন কাশীপুরের গোপাললাল শীলের বাগানে।

কলকাতা মহানগরীর অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁর ভাষণে বললেন—লক্ষের মধ্যে ক্বচিৎ এমন একজন মহাপুরুষ দেখা যায়। পুরুষ সিংহ বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জীবনে অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করলেন। অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বললেন—হে নাগরিকগণ, আজ তোমাদের কাছে আমি সন্ন্যাসীরূপে আসিনি, ধর্মপ্রচারকরূপেও নয়। আমি এসেছি আগেকার সেই বালক নরেনরূপে। মনে সাধ হয় নগরীর ধূলায় বসে তোমাদের সকলকে আমার মনের কথা বলি।

তারপর এক এক করে চিকাগো ধর্মসভা থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু ঘটনার বর্ণনা করলেন। তারপর যুবকদের সম্বোধন করে বললেন,—হে যুবকগণ, ওঠো-জাগো-আর ঘুমিয়ে থেকো না। শুভ মুহূর্ত আগত। তোমাদের মত আমিও একদিন বালক ছিলাম, আজ আমি যদি এইটুকু করতে পেরে থাকি তাহলে তোমরাও যে এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু করতে পারবে সে বিশ্বাস আমার আছে।

স্বামীজী বিদেশে থাকতে যারা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনায় সর্বদা কাল কাটাতো, আজ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে তারাই বুঝতে পারলো সূর্যের আলো যেখানেই পতিত হোক, কলুষিত হয় না, বরং, কলুষিত স্থানকে পবিত্র করে তোলে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিনে দক্ষিণেশ্বরে বিরাট অনুষ্ঠান উৎসবের আয়োজন হয়েছে। হাজার-হাজার পুণ্যপিপাসু নরনারী যোগ দিয়েছে তাতে। স্বামীজীও এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে তাঁর সকল গুরুভাইয়েরা।

কালীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীজী একবার বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলেন—শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রাণময়ী প্রতিমার সামনে। অমনি উপস্থিত বিশাল জনতা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল।

তারপর স্বামীজী এসে দাঁড়ালেন ঠাকুরের বাসগৃহে। এখানেও বিপুল জনতা অপেক্ষা করছিল। স্বামীজী আসতেই সমস্বরে ধ্বনিত হলো—জয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ!

স্বামীজী চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো বিরাট কালীমন্দিরের প্রতি অনু পরমানুতে যেন ঠাকুর স্বয়ং বিরাজ করছেন। চতুর্দিকে তাঁরই অসীম পুণ্যের প্রভাব বিদ্যমান।

পঞ্চবটিতে সাক্ষাৎ হলো গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম করে স্বামীজী বললেন,—জি. সি. সেই একদিন আর এই একদিন স্বামীজী গিরিশচন্দ্রকে জি. সি. বলে ডাকলেন।

গিরিশচন্দ্রের আনন্দ ধরে না। তিনি বললেন আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস, ইচ্ছে হয় আরো দেখি।

তারপর দুজনে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন মহানন্দে।

স্বামীজী চলে যাবার পর গিরিশচন্দ্র বললেন,—আমেরিকায় থাকতে কতলোক কত কি বলতো। আমি তখনই বলেছিলাম আমি যদি কখনো নিজের চোখের সামনেও নরেনকে অন্যায় করতে দেখি, তাহলেও বুঝবো আমার চোখের দোষ হয়েছে, সে চোখই উপড়ে ফেলবো। ওরে, সূর্য ওঠার আগে তোলা মাখন, ওকি আর জলে মেশে।

সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে সমাজের ব্যাধি সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন,—যদি বংশানুক্রমিক ভাব সংক্রমণ নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয় তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় আর অর্থব্যয় না করে অস্পৃশ্যের শিক্ষায় সে সমুদয় ব্যয় করো। যারা বুদ্ধিমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে, শিক্ষকগণ তাদের জন্য নিয়োজিত হোক। সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই রয়েছে নেই অনন্ত আত্মা। সুতরাং সকলেই মহৎ হতে পারে, সকলেই সাধু হতে পারে।

তারপর উচ্চবর্ণের লোকদের উদ্দেশে বললেন,—তোমরা হচ্ছো দশ হাজার বছরের ম্যমী, তোমরা কি বেঁচে আছো? তোমরা হচ্ছো চলমান শ্মশান। তোমরা শূন্যে বিলীন হয়ে যাও—আর নূতন ভারত

বেরোক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির থেকে, জেলে-মালী-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির ভিতর থেকে। মুদির দোকান থেকে। এরা সহস্র বছর অত্যাচার, দুঃখ ভোগ করেছে। নীরবে সহ্য করেছে। তাতে এরা পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, অটল জীবনীশক্তি। আধখানা শান্তির রুটি পেলে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। অতএব হে ধনী, তোমার যা কিছু আছে তা ফেলে দিয়ে তুমি অদৃশ্য হয়ে যাও।

এমনি করে দিনের পর দিন জলদ-মন্দ্র স্বরে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে স্বামীজীর মহাবাণী। স্তব্ধ বিস্ময়ে স্বামীজীর কথা ভাবতে থাকে আত্মবিস্মৃত জাতি।

স্বামীজীর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাঁর গুরুভাইদের নিয়ে লোক-কল্যাণকর বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

সেই প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'।

স্বামীজী বললেন,—আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, যাঁর জীবাত্মা আদর্শ বলে গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছি, সেই পরমপুরুষের নামেই হোক এই প্রতিষ্ঠানের নাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বের কল্যাণে যে সকল সত্য উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং নিজের জীবনে যা প্রতিপালিত করেছেন—তাই প্রচার করা এবং জনসাধারণকে সেই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাই হবে সঙ্ঘের লক্ষ্য। রাজনীতির সঙ্গে এ সঙ্ঘের কোন সম্পর্ক থাকবে না, জনকল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানই এর মুখ্য আদর্শ।

সর্বসম্মতিক্রমে স্বামীজী নির্বাচিত হলেন সঙ্ঘের সভাপতি।

স্বামী যোগানন্দ বললেন,—এইভাবে আমরা যদি নানা বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম, তাহলে আর সন্ন্যাস কোথায় হলো? ঠাকুরের কি এই উপদেশই ছিল?

প্রখর দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ চাইলেন যোগানন্দের দিকে,—তুই কি করে জানলি এগুলি ঠাকুরের কাজ নয়?

স্বামীজীর সকল যুক্তিতে হতাশ ভাবে যোগানন্দ বললেন,—আমরা তোমারই অনুদাস মাত্র। তোমার ইচ্ছামতই কাজ করবো।

স্বামীজী বুঝলেন, যোগানন্দ সন্তুষ্ট নয়। তিনি বললেন,—শোন,

সাধারণ ভক্তরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝতে পেরেছে, আসল ঠাকুর তো ততটুকু নন। তিনি করলে একপলকে এক লক্ষ বিবেকানন্দ জন্ম দিতে পারেন। তবু তা না করে এই একটা বিবেকানন্দের মধ্যেই তাঁর কাজ করতে চান, আমি তার কি করতে পারি বল। তিনি অনন্ত—অসীম তাঁর ভাব। তাই আমাদেরও কর্তব্য অসীম বিশ্বের মধ্যে প্রচার করা।

আর একজন ভক্ত বললেন,—সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এলাম একটু সাধন ভজন করতে, ভগবানকে পেতে, তা নয়-এখন সভা করো, বক্তৃতা দাও, ঘুরে ঘুরে প্রচার করো। ঠাকুরের উপদেশের আর ভাবের মধ্যে ঐক্য কোথায় তাহলে ?

স্বামীজী বলেন—তোরা মনে করিস শ্রীরামকৃষ্ণকে তোরা সব বুঝে ফেলেছিস, আর আমি কিছুই বুঝিনি ?

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ……সেই গুরুভ্রাতা তবুও বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বামীজী দিলেন প্রচণ্ড এক ধমক।

যাও—, কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়! কে দেখতে চায় তোমার শাস্ত্রে কি লেখা আছে? আমি যদি আমার দেশের লোককে তমোকূপ থেকে তুলে মানুষ করতে না পারি, তাহলে হাসতে-হাসতে হাজার বার নরকে যেতে রাজী আছি। রামকৃষ্ণই হোক আর যেই হোক আমি কারো দাস নই। শুধু যে নিজের ভক্তি-মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করে সর্বদা আমি তারই দাসানুদাস।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকেন স্বামীজী। আরক্তিম হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ মুখ। তিনি তখনই বিশ্রাম ঘরে চলে গেলেন। একটু পরে যোগানন্দ জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেন স্বামীজী ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। তাঁর প্রশস্ত ললাটে এক প্রশান্ত দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নিমীলিত দুটি চোখের নিচেয় যেন প্রজ্ঞাউন্মুক্ত দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছে সত্য-শিব-সুন্দরের ছবি। যোগামন্দ তাই দেখে ভক্তিতে-আবেশে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়ীতেই প্রথম 'রামকৃষ্ণ মিশন'

প্রতিষ্ঠিত হলো। গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন স্বামীজী, দেখ জি. সি.—জীবনটা তো কেষ্ট-বিষ্টু.করে কাটিয়ে দিলে, এবার একটু বেদ-বেদান্ত পড়ো।

গিরিশচন্দ্র অমনি 'জয় বেদরূপী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জয়' বলে প্রণাম করে বললেন,—আমার আর ওসব পড়ে কি হবে। দূর থেকে বেদ-বেদান্তকে নমস্কার করতে করতেই জীবনের বাকী কটা দিন কাটিয়ে দেব। দরকার ছিল লোক শিক্ষার, সে তো তুমিই রয়েছো।

গিরিশচন্দ্র আবার বললেন,—আচ্ছা নরেন, তুমি বেদ-বেদান্ত অনেক পড়েছ, কিন্তু তাতে দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্তনাদ, ব্যাভিচারাদি পাপ নিবারণের কোনো উপায় আছে? সমাজ যে কলঙ্কে ভরে উঠলো।

সেই কথা শুনে স্বামীজীর চোখ ছলছল করে ওঠে। কিছুক্ষণ পর বললেন, দেখ জি. সি. জগতের দুঃখ নিবারণের জন্যে একটি জীবের জন্যও যদি আমি কিছু করতে পারি, তাহলে হাজার বার গর্ভবাসের ক্লেশ সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। শুধু নিজের মুক্তি নিয়ে কি করব বলো? যদি সকলকে নিয়ে যেতে না পারলাম তাহলে আর কি হলো!

আবেগে স্বামীজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। গিরিশচন্দ্র মনে মনে বললেন—এত বড় হৃদয় না হলে কি তুমি জগৎ মাতাতে পারতে, না ঠাকুর তোমার উপর অতবড়ো কাজ দিয়ে যেতেন।

এরপর আবার ভারত ভ্রমণে বেরুলেন স্বামীজী। একের পর এক ভ্রমণ করলেন, বক্তৃতা দিলেন। প্রতিটি জায়গায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন তিনি।

তারপর আবার কলকাতায় ফিরে ধ্যান-ধারণা, অধ্যয়ণ-অধ্যাপনায় মন দিলেন। তারই মধ্যে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থীকে দর্শন দেওয়া, তাদের সঙ্গে বিস্তর কথা বলা। তারপর দেশ-বিদেশের শত শত চিঠি পত্র, টেলিগ্রামের জবাব দিতে হয়। একটি মুহূর্তও বিরাম নেই তাঁর।

ওদিকে সাগর পার থেকে মার্গারেট স্বামীজীর আহ্বানের প্রতীক্ষা করছিলেন। স্বামীজীর আহ্বান পেয়ে ছুটে এলেন ভারতে। সাগ্রহে তাকে গ্রহণ করলেন স্বামীজী। এরপর পাশ্চাত্যে স্বামীজীর অন্যতমা শিষ্যা মিস মুলারও এসে পৌঁছলেন ভারতে।

মিস মুলার স্বামীজীকে প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন ভারতের কল্যাণ-সাধনে। স্বামীজী সেই অর্থে বেলুড়ে একখণ্ড জমি কিনলেন মঠ নির্মাণের জন্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে স্বামীজী সমাগত সকল ভক্তকে উপবীত দান করলেন। স্বামীজী বললেন,—দ্বিজাতি মাত্রেই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে, বেদ তার প্রমাণ। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য সকল দ্বিজাতিকে শাস্ত্র সম্মত গায়ত্রী মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। তারপর আবার বললেন,—শতশত বৎসর ধরে এই ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা করেই আমরা আমাদের দেশকে উচ্ছন্নে দিয়েছি, কিন্তু আর নয়, এবার সকলকে টেনে তুলতে হবে, দেশের সকল মানুষকে উঠিয়ে নিতে হবে ব্রাহ্মণ পদবীতে। হিন্দু-মাত্রেই ভাই ভাই। তাদের শোনাতে হবে অভয় বাণী তোরাও আমাদের মতো মানুষ, আমাদের মত তোদেরও সব অধিকার আছে।

১৬ই মার্চ স্বামীজী মার্গারেটকে দীক্ষা দিয়ে তার নতুন নামকরণ করলেন "নিবেদিতা"। নতুন সত্ত্বায় জন্মগ্রহণ করলো ভারতসেবিকা নিবেদিতা। তাঁর আগেকার সকল সত্ত্বা লুপ্ত হয়ে গেল নতুন নাম-করণের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বামীজী বললেন,—যাও বৎসে, তুমি তাঁর অনুসরণ করো, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পর পাঁচ শত বার জীবের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন।

নিবেদিতার শিক্ষার ভার পড়লো সুপণ্ডিত স্বামী স্বরূপানন্দের উপর। সকল সন্ন্যাসীরা নিবেদিতাকে ভগিনী বলে গ্রহণ করলেন। সেইদিন থেকে তিনি ভারতের ইতিহাসে খ্যাত হলেন 'সিষ্টার নিবেদিতা'—বলে।

তারপর থেকে নিবেদিতাকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে

লাগলেন স্বামীজী। তিনি সকল সময়েই প্রিয় শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে সমভাব জাগিয়ে তুলতেন। কাজের মধ্যেই শিক্ষা দিতেন সাম্যের।

যে কেউ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করতো—আমি কেমন করে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, আপনার কোন কাজে লাগতে পারি আমায় বলে দিন। উত্তরে স্বামীজী বলতেন ছোট্ট একটি কথা—ভারতকে ভালবাসো।

এই সময়ে ক্রমশঃ স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে স্বামীজীর। বাংলায় তপন প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। তার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিবেদিতা স্বামীজীর সেবার ভার নিয়ে।

এই সংবাদ পেয়ে আলমোড়া থেকে সেভিয়ার দম্পতি আমন্ত্রণ জানালেন স্বামীজীকে। কাজের শেষে সশিষ্য স্বামীজী আলমোড়ায় গেলেন।

এখানে এসে খুব আনন্দের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। প্রতিদিন সময় মত শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন বা বিতর্ক সভা করতেন।

আলমোড়া থেকে কিছুদিন পর রাওলপিণ্ডি হয়ে শ্রীনগর এলেন। শ্রীনগর থেকে আচ্ছাবল। এখান থেকে প্রায় দু-তিন হাজার যাত্রী চলেছে অমরনাথ। স্বামীজীর মনেও অমরনাথ দর্শনের ইচ্ছা জাগলো। কিন্তু দুর্গম সেই পথে একমাত্র নিবেদিতা ছাড়া আর কেউ যেতে রাজী হলেন না। সকলে রইলেন পম্বল গ্রামে স্বামীজীর ফিরে আসা পর্যন্ত।

তুষারাচ্ছন্ন বন্ধুর হিমালয়ের পথে অনেক কষ্টে দুর্লঙ্ঘ্য পথের সকল বাধা বিপত্তি এড়িয়ে ২রা আগষ্ট ওঁরা অমরনাথের গুহায় এসে পৌঁছলেন।

গুহার মধ্যে তুষারলিঙ্গরূপী ভগবান মৃত্যুঞ্জয়ের শুভ্র জ্যোতির্ময় মূর্তির সামনে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন স্বামীজী। সেই অপূর্ব বিগ্রহের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তারপর অনেকক্ষণ পর যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন তখন এক

অনির্বচনীয় ভাবে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর সর্বাঙ্গ। হঠাৎ কথা বলতে বলতে আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি বললেন,—আজ আমার জীবন সার্থক হলো। পরম করুণাময় অমরনাথ কৃপা করে আমাকে দর্শন দিয়েছেন এবং 'ইচ্ছামৃত্যু' বর পেয়েছি আমি।

এরপর থেকে স্বামীজীর মুখে শুধু অমরনাথের কথা। শিবের মহিমা কীর্তন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মা-মা বলে ওঠেন। শুধুই বলেন, মা-কালী কল্যাণময়ী, তিনিই কাল—তিনিই পরিবর্তন। সেই করালীকে যদি পেতে চাও তো হৃদয়টাকে শ্মশান করে ফেল। তবে তাঁর আশীর্বাদও পাবে, দেখাও পাবে।

আবার বলেন,—ভিক্ষা করে নেব না কিছু মায়ের কাছ থেকে। আদায় করে নেবো আমরা জোর করে আমাদের মায়ের কাছ থেকে।

সেখান থেকে ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে। এখানে বসে ধ্যান জপ করেন। তারপর মন্দিরের জীর্ণদশা দেখে দুঃখ করে বললেন—হায়রে, সেই মুসলমান আমলে এর উপর কত অত্যাচার হয়েছে। মন্দির আজ ধ্বংসপ্রায়। যদি একটা নতুন মন্দির তৈরী করে দিতে পারতাম তাহলে আমার জীবন ধন্য হতো। মা-মাগো······

অমনি থর থর করে কেঁপে ওঠে সমস্ত মন্দির। গম্ভীর স্বরে এক অশরীরী বাণী ধ্বনিত হলো মন্দির মধ্যে—মূঢ়, আমাকে রক্ষা করবার তুই কে? তোকে আমি রক্ষা করছি, না তুই আমাকে রক্ষা করছিস্? অবিশ্বাসী বিধর্মীরা যদি আমার বা বিগ্রহ নষ্ট করে থাকে তোর কি তাতে।

সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে স্বামীজীর। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন কেউ কোথাও নেই। দৈববাণীর রেশ তখনো ধ্বনিত হচ্ছে—বৎস ইচ্ছা করলে আমি মুহূর্তে অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করতে পারি···আমার ইচ্ছায় সব কিছু হতে পারে।

স্বামীজীর মনে অনুশোচনা জেগে উঠলো। তিনি বুঝলেন··· মায়ের ইচ্ছা না হলে আমাদের কারো কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

তিনি যন্ত্রী আর আমরা যন্ত্র। তিনি যেমন বাজাবেন, আমরা তেমনি বাজবো। তিনি যা করাবেন তাই করতে হবে। আমরা শুধু কর্মী।

১৮ই অক্টোবর নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী বেলুড় ফিরে আসেন।

১১ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমা এলেন মঠের নতুন জায়গা দেখতে। তিনি আশীর্বাদ করলেন 'সকলের ইচ্ছা সফল হোক'।

৯ই ডিসেম্বর মঠের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট উৎসব হলো। পুণ্য অনুষ্ঠানে স্বামীজী একটা তামার কৌটার মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র দেহাবশেষ স্থাপন করলেন নির্দিষ্ট আসনে। তারপর তিনি তাঁর নিজের রচনা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে, অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ"।

স্বামীজী বললেন—ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন তুই আমাকে কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেইখানেই যাবো। তা সে কুটিরই হোক অথবা গাছতলাই হোক। বহুজনের হিতের জন্যে ঠাকুর বহুকাল পর্যন্ত এখানেই থাকবেন।

অস্থায়ীভাবে মঠ প্রতিষ্ঠা হলো সেদিন। কিছুদিনের জন্য নীলাম্বর বাবুর বাগানে কাজ চলতে লাগলো। ইঞ্জিনিয়ার হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালের স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মঠ নির্মাণের ভার নিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামিজীর হাঁপানি'র টান বড্ড বেড়েছে। প্রায়ই টান হতে লাগলো। তাছাড়া ক্রমশঃ যেন তিনি পাল্টে যাচ্ছেন। সর্বদাই কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন! দশবার জিজ্ঞাসা করলে একটা কথার উত্তর দেন।

ডাক্তার কবিরাজ আসতে লাগলেন দলে দলে। সকলেই বার বার বলেন সাবধান হতে—স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু স্বামীজী কারো কথায়ই কান দেন না। এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই।

অগত্যা সকলের অনুরোধে বৈদ্যনাথ ধাম গেলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারে।

জন্য। সেখানে কিছুদিন থেকে একটু উপশম হতেই আবার ফিরে এলেন মঠে।

মঠে ফিরেই নতুন সন্ন্যাসীদের কর্মমার্গ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি বার বার সকলকে বলতেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসর তোমরা ভারতবর্ষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। দেশসেবাই হবে তোমাদের একমাত্র ব্রত।

শুধু সাধন-ভজন-ধ্যান-ধারনাই স্বামীজীর নিত্যকর্ম ছিল না। সুযোগ পেলে তিনি রান্নাও করতেন অর্থাৎ গৃহস্থের কোন কাজই তাঁর অজানা ছিল না। সেই সব ছোট খাটো কাজের মধ্যে তিনি সকলকে এক হতে শিক্ষা দিতেন।

একদিন স্বামীজীর রান্না খেয়ে নিবেদিতা তো অবাক। উনি পুরুষ হয়ে এত ভালো রান্না করতে পারতেন। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার শেষে হঠাৎ নিবেদিতাকে হুকুম করলেন,—তামাকটা সেজে আনো তো। ঐখানে তামাক টিকে সব আছে।

এমনি আদেশ শুনে উপস্থিত সকলে অবাক। নিবেদিতা আর কি করেন, তামাক সাজা অভ্যাস নেই কিন্তু সাজতে দেখেছেন অনেক। আজও তেমনি দেখা বিদ্যে নিয়ে যা পারলেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাই এনে দিলেন।

দেখুন, ঠিক হয়েছে কিনা। বললেন নিবেদিতা, দুঃখ যে আপনি এমন সৌভাগ্য দিতে চাননা ; তাহলে অন্তত অভ্যেসটা থাকে !

হুঁকোয় টান দিয়ে পরম তৃপ্তিভরে স্বামীজী বললেন—বাঃ তুমি যে একেবারে ঘরের মেয়ে হয়ে গেছ।

পরে গুরুভাইদের বললেন,—আমি ঠিক তামাক সাজাবার জন্যেই নিবেদিতাকে দিয়ে তামাক সাজাইনি। কিছু লোকের চোখ খুলে দেবার জন্যেই কাজটা তাদের সামনে করলাম।

১৮৯৯ সালের ২০শে জুন শ্রীশ্রীমা'র আশীর্বাদ নিয়ে আবার সাগরপারে যাত্রা করেন স্বামীজী। ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছলেন।

১৬ই আগষ্ট তুরীয়ানন্দ এবং আমেরিকার শিষ্যদয়কে সঙ্গে নিয়ে নিউ-ইয়র্ক যাত্রা করলেন। তারপর আমেরিকা থেকে এলেন ফ্রান্সে!

এখানে এসে ভারতের জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। এখান থেকেই কাউকে না জানিয়ে ভারত অভিমুখে রওনা হলেন।

বোম্বাইতে জাহাজ থেকে নেমে এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন যে, তখুনি সন্ন্যাসীর পোষাক ত্যাগ করে সাহেবী পোষাক পরে ট্রেনে চেপে কলকাতায় রওয়ানা হলেন, যাতে কেউ তাঁকে চিনতে না পারে।

১৯০০ সালের ৯ই ডিসেম্বর। রাত অনেক হয়েছে। মঠের সন্ন্যাসীরা খেতে বসেছেন। এমন সময় বাগানের উড়িয়া মালী এসে সন্ন্যাসীদের জানালো—একো সাহেব আউচি। বলেই সে গেট খুলবার চাবি চাইলো। সন্ন্যাসীরা তখন কে কি করবেন চিন্তা করছেন, এমন সময় সাহেব এসে দাঁড়ালেন সকলেন সামনে। সকলেই অবাক। কেউ কেউ এগিয়ে আসে সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। কেউ আবার ইংরাজীতে দু একটা প্রশ্নও করলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

অমনি এক সঙ্গে সকলে আনন্দে বিষম চীৎকার করে ওঠে,—ওরে স্বামজী এসেছেন। মুহূর্তে মঠের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো সেই সংবাদ।

কিন্তু সাহেবী পোষাক কেন?

স্বামিজী একে একে সব কথা বললেন,—বুঝলি, তারপর মালীটা চাবি আনতে গেলে তোদের খাবার ঘণ্টা শুনে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম এখুনিই বুঝি সব সাবাড় হয়ে যাবে। তাই পাঁচিল টপকেই চলে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীর খাবার ব্যবস্থা হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর সেই রাত্রিটা শুধু গল্প-গুজব করেই কাটলো।

আবার স্বাস্থের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকলো। হাঁপানির নিদারুণ কষ্টের সঙ্গে বহু মূত্র দেখা দিল। অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ভগবানের ধ্যানে সমাহিত হয়ে থাকেন। আর সেই সময় আত্মগত

ভাবেই বলে ফেললেন,—যাক মৃত্যু যদি আসে তো ক্ষতি কি, যা ওদের দিয়ে গেলাম তা দেড় হাজার বছরের খোরাক।

সেবছর ইচ্ছা হলো মঠে ৺দুর্গাপূজা করবেন। অমনি আদেশ চেয়ে পাঠালেন শ্রীশ্রীমা'র কাছে। শ্রীমা'ও সানন্দে সম্মতি দিলেন।

শ্রীমা'র নামে সংকল্প করে বিরাট আড়ম্বর করে পুজো হ'ল মঠে। ৺বিজয়াদশমীর পরে লক্ষ্মীপুজোও করলেন।

তারপর একদিন হঠাৎ সংবাদ পেয়ে ভুবনেশ্বরী দেবীর সামনে এসে হাজির হলেন স্বামীজী। ভুবনেশ্বরী দেবী বললেন—তোমার ছেলেবেলায় আমি মানত করেছিলাম তোমাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দেব। এতদিন সেটা হয়ে ওঠেনি। তোমাকে একদিন যেতে হবে।

মায়ের কথা দুর্লঙ্ঘ্য। সঙ্গে সঙ্গে দিন স্থির করে সেই নির্দিষ্ট দিনে কালীঘাট গেলেন। সেখানে মায়ের ইচ্ছানুযায়ী পুজো করলেন। সেদিন নিতান্ত শিশুটির মত মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন।

মঠে ফিরে শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে বললেন কালীঘাটে দেখে এলাম কেমন সুন্দর সাম্য ভাব। আমাকে বিলেত ফেরৎ সন্ন্যাসী জেনেও মন্দিরে ঢুকতে বাধা দিলনা বরং পরম সমাদর পেলাম।

সেবার জাপান থেকে আচার্যপাদ ওডা আর তাঁর সহযোগী মিঃ ওকাকুরা স্বামীজীকে দর্শন করতে এলেন।

বিদায় নেবার সময় তাঁরা অনুরোধ করলেন তাঁদের সঙ্গে বোধগয়া দর্শন করতে যাবার জন্য। অস্বীকার করলেন না স্বামীজী।

কাশীতে থাকাকালে কিছু বাঙ্গালী যুবক স্বামীজীর উপদেশে চাঁদা তুলে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে সেখানে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অন্ধ-খঞ্জ ও অসহায় মানুষের ব্যবস্থা করলেন।

উদ্বোধন প্রসঙ্গে আশীর্বাদ করে স্বামীজী বললেন, আমি এমনি একদল যুবককে মনে প্রাণে চেয়েছিলাম। এরই নাম প্রকৃত মানবধর্ম। তোমরা ধৈর্য্য হারিও না। অর্থের জন্য চিন্তা করোনা, অর্থ এসে যাবেই। ভগবান তোমাদের সহায় হোন। যেখানেই

দেখবে বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রোগ-শোক, আর্তের হাহাকার সেখানেই এগিয়ে যাবে তোমরা। আমি আশীর্বাদ করছি তোমাদের এই শিশু প্রতিষ্ঠান একদিন বিরাট হয়ে উঠবে।

স্বামীজীর আশীষাপ্লুত সেদিনকার সেই শিশু প্রতিষ্ঠানই আজকের "রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম"।

কাশী থেকে বেলুড়ে ফিরে এসেই স্বামীজীর শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো। এবার একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। হাত পা ফুলে গেল। দেহে জল জমলো।

নিবেদিতা দেখতে এলেন তাঁর পিতৃপ্রতিম গুরুকে। স্বামীজী স্নেহভরে বললেন—বসো। নিবেদিতা বসো। নিবেদিতা বসে গুরুর শরীর দেখে চোখের জল সংবরণ করে বললেন—আপনি কাশীতেই ভাল ছিলেন দেখছি।

মৃদু হেসে স্বামীজী বললেন—গীতায় পড়েছো তো—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—তথা শরীরাণি"? আমার এই দেহটারও বোধ হয় নতুন দেহের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নিবেদিতা আর বিরক্ত না করে বিদায় নিলেন।

স্বামীজী ইদানীং প্রায়ই দেহত্যাগে কথা বলতেন। একজন গুরুভ্রাতা একদিন সামনা-সামনি বলে ফেললো—আচ্ছা ঠাকুর যে বলতেন, আপনি যেদিন জানতে পারবেন আপনি কে, সেদিন আর দেহ রাখবেন না। তা, আপনি জানতে পেরেছেন কি?

একটু হেসে স্বামীজী বললেন,—তা পেরেছি বৈ কি!

তাহলে কি স্বামীজী ছেড়ে যাবেন? এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয় সকলের।

সেদিন একাদশীর উপবাস করে নিবেদিতাকে ও অন্যান্য শিষ্যদের নিজে রান্না করে খাওয়ালেন। খাবার শেষে সকলের হাতে নিজে জল ঢেলে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন।

একজন শিষ্য প্রতিবাদ করে বললেন, আপনি এসব করছেন কি?

স্বামীজী হেসে বললেন, করতে আর পারলাম কই। ভগবান যীশু নিজের হাতে তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

শিষ্যের মন চমকে উঠলো—সে তো শেষ সময়ে তবে কি স্বামীজী সত্যই চলে যাবেন!

সেদিন স্বামী শুদ্ধানন্দকে একটা পাঁজি আনতে বললেন। পাঁজি হাতে পেয়ে পাতার পর পাতা উলটে চলেছেন। তারপর শিষ্যদের ডেকে বললেন,—আমি দেহত্যাগ করলে ঐখানে আমার সৎকার করিস।

শিষ্যরা আরো বিচলিত হয়ে ওঠেন তাহলে স্বামীজী বোধ হয় দেহত্যাগের সময় ধার্য করে ফেলেছেন। কারো আর বুঝতে বাকি রইলো না। দিন সমাগত।

৪ঠা জুলাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ।

সেদিন চিরদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে সকলের সঙ্গে ধ্যান করতে না বসে গল্প গুজব করতে থাকলেন। জীবনের অতীত সব ঘটনা বলতে লাগলেন।

পরদিন অমাবস্যা শনিবার। মঠে ৺কালীপূজা করালেন।

সন্ধ্যাক্রিয়াদি শেষ করে উপরের শোবার ঘরে চলে গেলেন সন্ধ্যার পরেই। তারও খানিকক্ষণ পর একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে ঘরের সব জানলা দরজা খুলে দিতে বললেন।

ব্রহ্মচারী নীরবে আদেশ পালন করলো। খোলা জানালা পথে বহুদূর তাকিয়ে রইলেন স্বামীজী। সেই অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো দক্ষিণেশ্বরের দিকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়লেন।

তারপর খানিকক্ষণ পর তিনি পদ্মাসনে ধ্যান করতে বসে ব্রহ্মচারীকে বাইরে বসে মালা জপ করতে আদেশ করলেন।

এমনি করে ধ্যানস্থ হবার একঘণ্টা পরে হঠাৎ মেজের উপর শুয়ে বলে উঠলেন,—আমাকে বাতাস করো।

ব্রহ্মচারী ছুটে এসে বাতাস করতে লাগলো।

রাত তখন নটা। বাইরের পৃথিবীর বুকে অন্ধকার আরো জমাট বেঁধেছে। জানালার বাইরে কলকল শব্দে পরিপূর্ণ ভাগীরথী বয়ে চলেছে। স্বামীজী একবার পাশ ফিরলেন।

তারপর ছোট্ট শিশুটির মত কেঁদে উঠলেন। একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো। তারপর মাথাটি কাত হয়ে বালিশ থেকে পড়ে গেল।

স্বামীজীর দেহ নিথর-নিষ্পন্দ হয়ে গেল চিরজীবনের মত।

মহানিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করলেন কর্মক্লান্ত মহাযোগী।

ব্রহ্মচারী কিছু বুঝতে না পেরে ছুটে গিয়ে নিচেয় সংবাদ দিতে সকলে দৌড়ে এলো। কিন্তু হায়!

মুহূর্তে চারিদিকে হায় হায় রব পড়ে গেল।

পরদিন সকাল থেকে বিদ্যুৎগতিতে সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর আকাশে বাতাসে।

সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা এলেন বাগবাজার থেকে। ব্যজন করলেন বহুক্ষণ—তাঁর পিতৃ প্রতিম আচার্যদেবকে। এত বড়ো প্রিয়জনকে বিদায় দিতে কারই বা মন চায়?

বেলা দুটো। স্বামীজীর পুণ্যদেহ গৈরিকবস্ত্রে ঢেকে ফুলমালায় সাজানো হল। একে একে সকলে প্রণাম করলেন বিগত আত্মা [illegible] চরণে।

[illegible] নীত হলো স্বামীজীর নির্দেশমত জায়গায়।

[illegible] র আগুন জ্বলে ওঠে পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে ভারতা[illegible] মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের।

[illegible] যোগী ফিরে গেলেন সেই লোকে, যে লোক থেকে তি[illegible]তে [illegible]র্ণ হয়েছিলেন মানব কল্যাণের জন্যে।

প্রয়োজনের শেষে বুঝি সেই চাবি দিয়ে দ্বার খুলে তাঁর মানস-সন্তানকে নিজের কাছে টেনে নিলেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

ওঁম শিবায়